তিন গোয়েন্দা

অপারেশন কক্সবাজার

রকিব হাসান

প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় তছনছ করে দিয়ে গেছে
কক্সবাজার উপকূল। ধ্বংস হয়েছে ঘরবাড়ি, গাছপালা,
ফসলের খেত; মারা গেছে অগণিত পশু-পাখি, মানুষ।
দুর্গতদের সাহায্য করতে বাংলাদেশে ছুটে এল তিন গোয়েন্দা।
হাসপাতালে যন্ত্রণাকাতর আহত মানুষের আর্তনাদ।

ডাক্তার আর নার্সদের সাহায্য করার জন্যে
স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ার হিসেবে যোগ দিল কিশোর পাশা।
ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর কিছু মানুষের শত্রুতে পরিণত হলো,
যারা নিজের স্বার্থে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করে না।
কিন্তু 'পরাজয়' বলে কোন শব্দ
তিন গোয়েন্দার অভিধানে নেই।
ধীরে ধীরে খুলতে আরম্ভ করল এক জটিল রহস্যের গিট।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

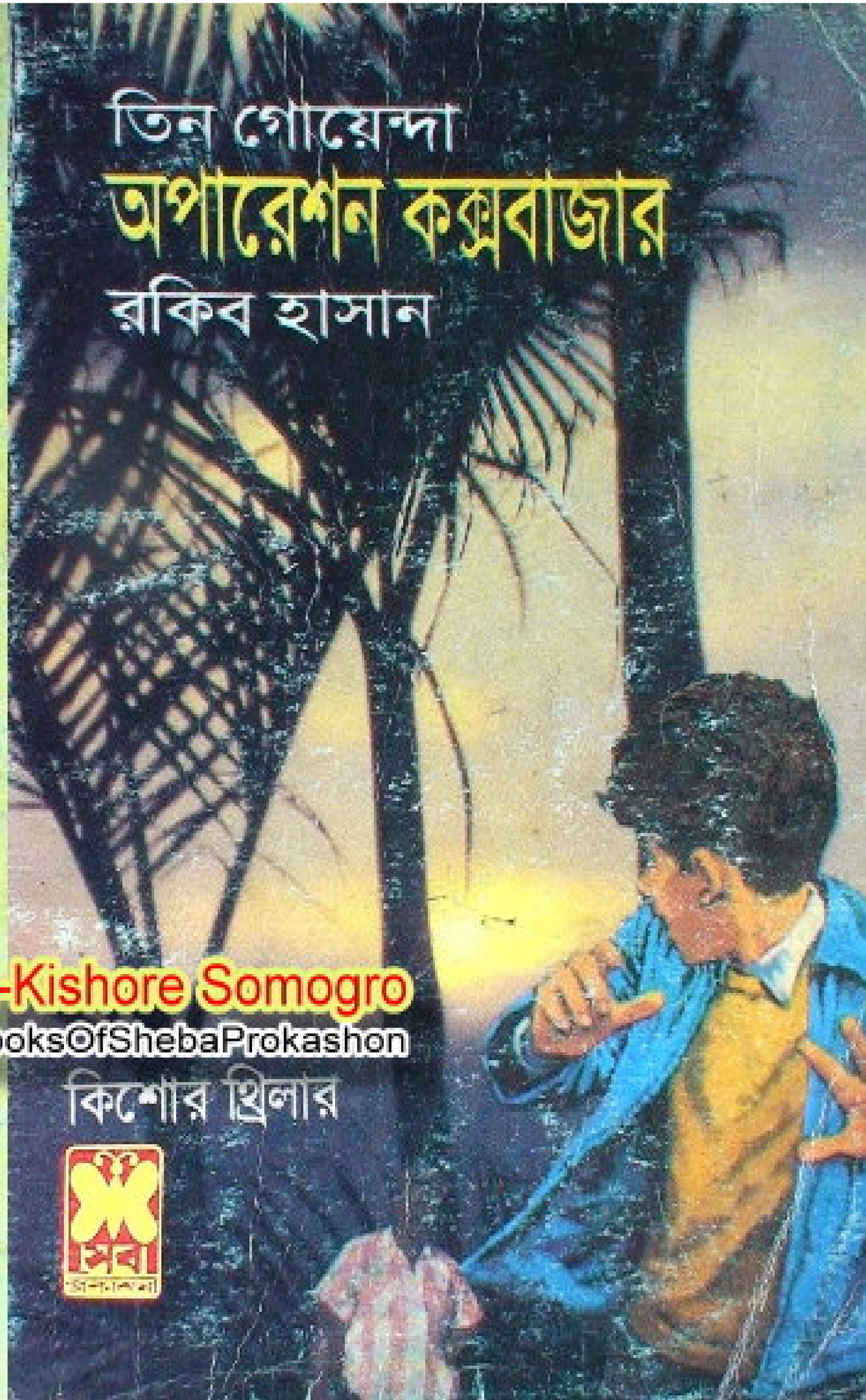

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

সেবা প্রকাশনীর
আরও কটি কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা সিরিজ:
তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা, ছায়াশ্বাপদ, মমি, রুদ্রদানো, প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগরসৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ ১, ২, সবুজ ভূত, হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি, কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি, ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১, ২, ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব, ভীষ সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল, মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর, পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ, আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ, পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল, বারটা প্রয়োজন, খোড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১, ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো, প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ডাঙা ঘোড়া, ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু, পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন, পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর, প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ, ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ, খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড, বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া, খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ, ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার, চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত, জিনার সেই দ্বীপ, ঐতিহাসিক দুর্গ, ঝামেলা, কুকুরখেকো ডাইনী, নরকে হাজির, বিড়াল উধাও, ঠগবাজি, যুদ্ধঘোষণা, মারাত্মক ভুল, মঞ্চভীতি, খেলার নেশা, বিষের ভয়, দীঘির দানো, উল্কি রহস্য, নকশা, ডাকাতের পিছে, মৃত্যুঘড়ি, জলদস্যুর মোহর, শয়তানের থাবা, গুপ্তচর শিকারি, পতঙ্গ ব্যবসা, পুরানো কামান, টাকার খেলা, জাল নোট, মাকড়সা মানব, গেল কোথায়, বিষাক্ত অর্কিড।

অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ:
ষড়যন্ত্র ১, ২, অনুসন্ধান, কালকুক্ষি, আমি টাইগার বলছি, মাকড়সার জাল।

রোমহর্ষক সিরিজ:
যাও এখান থেকে, বিষধর, নরবলি, পাগলাঘন্টী, চরমপত্র, অপারেশন বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, পলাতক, নিরুদ্দেশ, অভিশপ্ত ছুরি, নরখাদকের দেশে, শ্বেতহস্তী।

গোয়েন্দা রাজু সিরিজ:
মামার মন খারাপ, সাবাস!, বিরোধী দল, দামী কুকুর, হিপ হিপ হুররে, চকলেট কোম্পানী, নতুন হেডকোয়ার্টার, সার্কাস, খেলনা বিমান ও সোনার মেডেল, সুরের নেশা ও আজব ভূত, আজব রশ্মি, জাহাজ চুরি, নকশা পাচার, টাকের ওষুধ।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

এক

পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। তারই বয়েসী আরেকটা ছেলে এগিয়ে আসছে করিডর ধরে। হাতে সুতোয় বাঁধা আট-দশটা বেলুন। পাশ দিয়ে চলে গেল ছেলেটা। যাওয়ার আগে একবার মুখ তুলে তাকাল। ঢুকে পড়ল ১৫ নম্বর কেবিনে।

ফাঁক হয়ে রইল দরজাটা। চোখ পড়ল ভেতরে। কিশোর দেখল, বেডে একটা ছোট ছেলে শুয়ে আছে। বিছানা আর টেবিল বোঝাই নানা রকম খেলনা। ওগুলোর সঙ্গে যোগ হলো বেলুনগুলো। নিশ্চয় বড়লোকের ছেলে। আদর আহ্লাদের অন্ত নেই।

এটা চিলড্রেন্স ফ্লোর। শিশুদের চিকিৎসা হয়। চার তলায়। আজ থেকে তার ডিউটি এখানে। গত কয়েক দিন ছিল অর্থোপেডিক ফ্লোরে। হাড়ভাঙা মানুষের সেবাযত্ন করতে হয়েছে। ওর হাতে কয়েকটা এক্স-রে প্লেট। একজন ডাক্তারের কাছে দিয়ে আসতে পাঠানো হয়েছে তাকে।

চকচকে করিডর ধরে আরও কিছুদূর এগোল সে। কনস্ট্রাকশনের কাজের নানা রকম ঘড়ঘড়ে শব্দ আর ঠুকুস-ঠাকুস

কানে আসছে সামনের দিক থেকে। হাসপাতালের আরেকটা নতুন উইং তৈরি হচ্ছে। ওটাও এটার মতই চার তলা। করিডরের শেষ মাথায় একটা ভারি দরজা। তাতে সাদা রঙে বড় বড় করে লেখা:

বিপদজনক!

বিল্ডিং তৈরির কাজ চলছে।

সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

কেন প্রবেশ নিষেধ অনুমান করতে পারল কিশোর। অসমাপ্ত ফ্লোর। কৌতূহলী হয়ে কেউ ওখানে ঢুকে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

বিদেশী অর্থে তৈরি হচ্ছে দেশের এই আধুনিকতম হাসপাতাল—কক্সবাজার ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট। হাসপাতাল চালু হয়ে গেলেও এখনও বহু কাজ বাকি। সমুদ্র সৈকতের কাছে আবহাওয়া ভাল আর প্রচুর জায়গা আছে বলে এখানে হাসপাতালের স্থান নির্বাচন করেছে কর্তৃপক্ষ। ক্যান্সার সহ নানা রকম জটিল রোগের গবেষণা আর চিকিৎসা হবে। ঢাকা আর অন্যান্য বড় বড় শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন ভাল। দেশের যে কোন জায়গা থেকে রোগী আসায় তেমন কোন অসুবিধে নেই। তবে আপাতত কক্সবাজার আর আশপাশের এলাকার রোগীতেই হাসপাতাল ভরে গেছে। বেশির ভাগই মারাত্মক জখম হওয়া আর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। দিন কয়েক আগে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেছে উপকূল জুড়ে। এ তারই জের।

এক্স-রে প্লেটগুলো পৌঁছে দিয়ে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। আবার তাকাল দরজাটার দিকে। মিস্ত্রীদের হাতুড়ি-

বাটালের ঠুকুর-ঠাকুর, করাতের খড়াৎ খড়াৎ শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল হালকা কান্নার শব্দ। থমকে দাঁড়াল সে। কান পাতল আবার। আন্দাজ করল কোন ঘরটা থেকে আসছে। ১৭ নম্বর ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। শব্দটা আসছে ওই ফাঁক দিয়ে।

কৌতূহল হলো ওর। উঁকি দিল ১৭ নম্বর কেবিনে।

সাদা বিছানায় দরজার দিকে পেছন করে শুয়ে আছে একটা ছোট্ট ছেলে। একা। আর কেউ নেই ঘরে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল কিশোর। 'কি হয়েছে তোমার?'

ফিরল না ছেলেটা।

ঘরটায় চোখ বোলাল কিশোর। পনেরো নম্বরের মত খেলনা, ফুল আর ছবি দিয়ে বোঝাই করে রাখা হয়নি। অসুস্থ, ভীত বাচ্চাটাকে খুশি করার জন্যে কিছুই নেই এখানে।

'কাঁদছ কেন?'

কান্না থামিয়ে দিল ছেলেটা। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে, তাই গলা দিয়ে হুঁক, হুঁক করে হেঁচকির মত শব্দ বেরোতেই থাকল। ফিরল না। দরজার উল্টো দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

বিছানার পায়ের কাছে রেলিঙে ঝোলানো মেডিকেল চার্টটা পড়ল কিশোর। তাতে জানা গেল ছেলেটার নাম তরিকুল ইসলাম দিপু। বয়েস পাঁচ বছর তিন মাস। নিউমোনিয়া হয়েছিল। সেরে উঠেছে। কয়েকদিন ধরে আর জ্বর আসছে না। তারমানে বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে। তাহলে কাঁদছে কেন?

বিছানার পাশ ঘুরে ছেলেটা যেদিকে মুখ করে আছে সেদিকে

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

এগোল কিশোর। সুন্দর চেহারা। রক্তশূন্য হয়ে যাওয়ায় ফর্সা মুখটাকে বেশি ফ্যাকাসে লাগছে। কোঁকড়া কালো চুল। গাল চেপে রেখেছে বালিশে।

কোমল গলায় আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার? আব্বু-আম্মু নিতে আসছে না, তাই?'

জবাবে 'হিঁক' করে শব্দ বেরোল ছেলেটার গলা থেকে। কথা বলল না।

পাশের টেবিলে রাখা বাক্স থেকে টিস্যু পেপার বের করে ওর গালের পানি মুছিয়ে দিতে গেল কিশোর। মুখ সরিয়ে নিল ছেলেটা। ওর ছোট্ট একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল কিশোর। 'আর কেঁদো না। তোমার অসুখ ভাল হয়ে গেছে। দু'একদিনের মধ্যেই বাড়ি নিয়ে যাবে।'

জবাবে জোরে একবার ফুঁপিয়ে উঠে চোখ বুজে ফেলল ছেলেটা।

বিছানায় ওর পাশে বসল কিশোর। 'কথা বলতে ইচ্ছে করছে না? ঠিক আছে, বোলো না। যতক্ষণ কেউ না আসে আমি তোমার কাছে বসছি। আর একা লাগবে না। গল্প শুনবে?'

ঝটকা দিয়ে হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা। গটমট করে ভেতরে ঢুকল এক মাঝবয়েসী মহিলা। বুকের ট্যাগে নাম লেখা সাফিয়া বেগম। নার্স। ঝাঁঝাল কণ্ঠে ধমকে উঠল, 'তোমার এখানে কি?'

কয়েক ঘণ্টায়ই মহিলাকে চেনা হয়ে গেছে কিশোরের। ভয়ানক কড়া আর বদমেজাজী। সারাক্ষণ মুখ গোমড়া করে রাখে। কেউ নাকি কখনও হাসতে দেখেনি তাকে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'না, কিছু না...বাচ্চাটা কাঁদছিল, ওকে হাসানোর চেষ্টা করছি...'

'কাজ ফেলে এখানে কি? ওকে হাসানো তোমার ডিউটি নয়। ও কারও সঙ্গে কথা বলে না। হাসাতে তো পারবেই না, বরং বিরক্ত করছ ওকে। যাও, নিজের কাজে যাও।'

ভয়ানক কর্কশ গলা মহিলার। অনেক নার্স আর ডাক্তারই এ রকম খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়। এ জন্যে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না তাদের। সাংঘাতিক কাজের চাপ। দিন রাত খাটুনি। বিশ্রামের সময় কম। তা ছাড়া রোগীর সঙ্গে সারাক্ষণ ওঠাবসা করাটা এক ঝকমারির ব্যাপার। স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে।

তর্ক করল না আর কিশোর। দরজা দিয়ে বেরোনোর আগে ফিরে তাকাল। নার্স সাফিয়ার বিশাল শরীরের একপাশ দিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে দিপু। চোখে পানি।

ছেলেটার চোখে অনুনয়ের দৃষ্টি। নীরবে কিছু বলার চেষ্টা করছে ওকে। আচরণটা স্বাভাবিক মনে হলো না কিশোরের।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

দুই

দুপুরে লাঞ্চের সময় হাসপাতালের ক্যান্টিনে বসে ঘটনাটা রবিনকে জানাল কিশোর।

ভাতে মুরগীর ঝোল মাখাতে মাখাতে হাসল রবিন। 'এলে তো দুর্গতদের সাহায্য করতে। এর মধ্যেও রহস্য?'

'রহস্য আছে কিনা জানি না। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি।' রবিনের খাকি শার্টের হাতায় সেলাই করে লাগানো রেড ক্রসের চিহ্ন লাল ক্রসটায় একটা মাছি বসেছে। টোকা দিয়ে সেটা উড়িয়ে দিল। ওর নিজের পরনেও একই পোশাক। রেড ক্রস থেকে সাপ্লাই করা স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারের ইউনিফর্ম। 'তোমার কথা বলো। গুদাম সামলাতে কেমন লাগছে?'

'চেয়ার-টেবিলে বসে থাকা। কেউ মাল নিতে এলে রেজিস্টারে তার নাম-ঠিকানা আর মালের বিবরণ লিখে রেখে হাতে একটা নোট ধরিয়ে দেয়া। বোরিং। তোমার কাজটা তার চেয়ে অনেক বেশি ইনটারেস্টিং।'

'হুঁ, তা তো বটেই—নদীর এপার কহে···রোগীর আহা-উহ আর চেঁচানো শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। বেশির ভাগ জখমী।

কারও হাত নেই, কারও পা কাটা, কারও শরীরে সেলাই পড়েছে একশো তেতাল্লিশটা। বীভৎস দৃশ্য। রাতে ঘুমের মধ্যেও চিৎকার শুনি।'

দুপুর বেলা। খাওয়ার সময়। পুরো ক্যান্টিনে একটা টেবিলও খালি নেই। হাসপাতালের লোক ছাড়া বাইরের কারও খাওয়ার নিয়ম নেই এখানে। তবে রেড ক্রসের ভলান্টিয়ারদের স্পেশাল পারমিশন দেয়া হয়েছে। সেজন্যেই ঢুকতে পেরেছে রবিন।

'কিন্তু যাই বলো, তার মধ্যেও একটা লাইফ আছে। শুধু শুধু বসে থাকতে কারও ভাল লাগে? এরচেয়ে লটারির টিকিট বিক্রি করাও ভাল। নেহায়েত দুর্গতদের সাহায্য করতে এসেছি, তাই···' যেন ভাল না লাগাটা বোঝানোর জন্যেই মুরগীর রানে সজোরে কামড় বসাল রবিন। চিবাতে চিবাতে বলল, 'এখানকার রান্নাটা সত্যি ভাল···'

কিশোরের পেছনে তাকিয়ে থেমে গেল রবিন।

ফিরে তাকাল কিশোর।

ওদের চেয়ে দু'তিন বছরের বড় একটা ছেলে ট্রে হাতে এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ। 'আমি বসি এখানে? তোমাদের অসুবিধে হবে? আর কোথাও জায়গা নেই।'

'চেয়ার কই?'

হাসল ছেলেটা, 'ব্যবস্থা করছি।' হাতের ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কাউন্টারের দিকে চলে গেল সে। একটা টুল তুলে নিয়ে এল। সেটাতে বসে বলল, 'ক্যান্টিন আরও বড় করা দরকার।' গায়ে একটা সাদাকালো ডোরাকাটা গেঞ্জি। বুকের কাছে বিশাল এক

কুমিরের ছবি আঁকা। বাঁকা লেজের নিচে ইংরেজিতে লেখা কথাটার মানে: আমি পৃথিবীর শাসনকর্তা। কুমিরের ওপরে একপাশে সেফটিপিন দিয়ে ঝোলানো একটা ব্যাজ। তাতে তার নিজের নাম এবং চিটাগাঙের একটা কলেজের নাম লেখা। 'তোমাদের অসুবিধে করলাম, না?'

'না না, অসুবিধে নেই,' নিজের বাসনটা আরেকটু সরিয়ে ছেলেটাকে বাসন রাখার জায়গা করে দিল রবিন। 'খান আপনি।'

'আমাকে আপনি আপনি করার দরকার নেই,' বাটি কাত করে মাছের তরকারি পুরোটাই ভাতের ওপর ঢেলে নিল ছেলেটা। 'তোমাদের চেয়ে বয়েসে খুব একটা বড় হব না। আমার নাম অরুণ চন্দ্র মোদক।'

'আমি কিশোর...' নিজেদের পরিচয় দিতে যাচ্ছিল কিশোর।

থামিয়ে দিল ওকে অরুণ, 'জানি। তোমার নাম কিশোর পাশা। বেগম মেহের বানুর বোনপো। আমেরিকা থেকে এসেছ। ও রবিন মিলফোর্ড। তোমার বন্ধু।'

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। চোখে নীরব প্রশ্ন।

'কি করে জানলাম ভাবছ তো?' ঝোল দিয়ে মেখে ভাত মুখে পুরল অরুণ। মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল, 'তোমাদেরকে ওই বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছি। কাছেই আমাদের বাড়ি। আমি কক্সবাজারের ছেলে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'যখন দেখলাম একই হাসপাতালে স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারের কাজ করছ, খোঁজ নিলাম। তোমাদের পরিচয় জানতে মোটেও অসুবিধে হয়নি আমার।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

ছেলেটা মিশুক। দ্রুত আলাপ জমিয়ে নিল দুই গোয়েন্দার সঙ্গে। জানাল তার বাবা নেই। জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছে। চিটাগাঙে কলেজে পড়ে। এইচ এস সি দিয়েছে। রেজাল্ট বের হয়নি। তার বিশ্বাস, খুব ভাল করবে। মেডিকেলে ভর্তি হবে। মায়ের ইচ্ছে, ছেলেকে ডাক্তার বানাবেন। ক্যান্সার হাসপাতালে সেও স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছে। তবে রেড ক্রসের তরফ থেকে নয়।

'ভালই তো,' কিশোর বলল, 'আগে থেকেই হাসপাতালে কাজ করার হাতেখড়ি নিয়ে নিচ্ছ।'

'হ্যাঁ, মা খুব খুশি।'

'কেন, তুমি খুশি নও?'

প্রশ্নটা যেন শুনতে পেল না অরুণ। কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি আবার ভাত মুখে দিল। ব্যাপারটা লক্ষ করল কিশোর।

লাঞ্চের সময় মাত্র আধঘণ্টা। বেশি কথা বলার সময় নেই। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে কিশোর আর রবিনের। খাবারের বিল আগেই দিয়ে দেয়ার নিয়ম। দিয়ে দিয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল ক্যান্টিন থেকে।

রবিন চলে গেল হাসপাতালের কাছেই একটা প্রাইমারি স্কুলের দিকে। ওখানে আস্তানা গেড়েছে রেড ক্রস।

নিজের ফ্লোরে ফিরে এল কিশোর। কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করল ওয়ার্ডের বিছানাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। দেখল কোন রোগীর কোন সাহায্য দরকার হয় কিনা। কিন্তু তার মন পড়ে আছে

নম্বর ঘরে। শেষে আর থাকতে না পেরে পায়ে পায়ে চলে এল ওটার সামনে। দরজা ফাঁক। যেন তাকে দেখে কাকতালীয় ভাবে একঝলক বাতাস ঝাপটা দিয়ে আরও ফাঁক করে দিল পাল্লাটা। সরাসরি ভেতরটা দেখতে পেল কিশোর। দিপুর বিছানায় ঝুঁকে কি যেন করছে নার্স সাফিয়া। লাথি মেরে ওকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে ছেলেটা।

দ্রুত দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর।

বোধহয় ছায়া পড়তেই বা অন্য কোন কারণে টের পেয়ে গেল নার্স। ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে দেখে চোখ জ্বলে উঠল, 'আবার এসেছ?'

'ভাবলাম ছেলেটা কাঁদছে কিনা দেখে যাই। কি করছেন?'

সাফিয়ার হাতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। 'রক্ত নেবার চেষ্টা করছি। কিছুতেই দিচ্ছে না পাজি ছেলেটা। তুমি এখন যাও এখান থেকে।' আপনমনে গজগজ করতে লাগল, 'এই স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারগুলোকে নিয়ে হয়েছে যন্ত্রণা। কাজের কাজ কিচ্ছু করবে না, খালি ঝামেলা বাড়াবে।'

দিপুর দিকে তাকিয়ে একটা সহানুভূতির হাসি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। তাড়াহুড়া করে হেঁটে চলল করিডর ধরে। এতটাই অন্যমনস্ক, ওষুধপত্র ঠেলে নিয়ে আসছিল একজন ওয়ার্ডবয়, মোড় নিতে গিয়ে তার ট্রলিতে ধাক্কা লাগিয়ে দিল।

নার্স স্টেশনের দিকে রওনা হলো সে। ওখানে আছে নার্স বিশাখা গোমেজ। সাফিয়ার মত অত বদমেজাজী নয়। তাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো দিপুর সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর পাবে।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

দেখল একজন মাঝবয়েসী মহিলার সঙ্গে কথা বলছে নার্স বিশাখা। বলছে, 'আর একটা দিন ধৈর্য ধরুন। সেরেই তো গেছে আপনার ছেলে। পুরোপুরি সারল কিনা শিওর হতে পারছে না ডাক্তাররা। হলেই রিলিজ করে দেয়া হবে।'

মুখিয়ে উঠল মহিলা, 'আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাব, তাতে ডাক্তার সাহেবদের কি? দায়-দায়িত্ব সব আমার...'

সাফিয়া হলে এতক্ষণে চটে উঠত। কিন্তু রাগ করল না বিশাখা। মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে বলল, 'রাগ করবেন না মিসেস ইসলাম, অসুখ ভাল হলো কিনা শিওর না হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার নিয়ম নেই। অহেতুক চাপাচাপি করছেন।'

'আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাব তাতে হাসপাতালের কি?'

ও, এই মহিলা তাহলে দিপুর মা। কথা বলতে ইচ্ছে করল কিশোরের। কিন্তু মেজাজ দেখে সাহস পেল না। নার্স সাফিয়া এসে ঢুকল।

সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। চট করে সাফিয়ার চোখের আড়ালে সরে গিয়ে আবার রওনা হলো দিপুর ঘরের দিকে।

এখন আর কাঁদছে না দিপু। শান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে।

'বাহ্, এই তো লক্ষ্মী হয়ে গেছ,' হেসে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'জানো কে এসেছিল?'

নড়ল না দিপু।

'নার্স বলেছে, কাল তোমাকে বাড়ি যেতে দেবে।'

কিশোরের দিকে ফিরল দিপু। গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

'ছিহ্, আবার কাঁদছ! শোনো, তোমার আম্মু এসেছেন। কাল বাড়ি নিয়ে যাবেন।'

শুনে খুশি হওয়ার কোন লক্ষণ দেখাল না দিপু। মুখ ফিরিয়ে নিল। প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে যেন ওর। চোখ টেনে খুলে রাখতে পারছে না। চোখ মুদল। বিছানার ধার ঘেঁষে এসে গায়ে হাত রাখল কিশোর।

আস্তে করে একটা হাত ওর হাতে তুলে দিল দিপু। ঘুমিয়ে পড়ার আগে আঁকড়ে ধরল কিশোরের হাতটা।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

তিন

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে জানালার কাছে বসে আছে কিশোর। রবিন পাশের ঘরে বই পড়ছে।

বাড়িটা পাহাড়ের ঢালে। সমুদ্র দেখা যায় এখান থেকে। মেঘলা আকাশ। চাঁদ নেই। সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে। দেখা যাচ্ছে না কিছু।

সাগর পাগল লোক আয়না খালার স্বামী, তাই সাগরের ধারে পাহাড়ের ঢালে শখ করে বানিয়েছেন এই বাড়ি।

কিশোরের মায়ের খালাত বোন বেগম মেহেরুন্নিসা বানু, ডাকনাম আয়না। স্বামী তাহের উদ্দিন হাজারি ফেণীর লোক। জাহাজের ক্যাপ্টেন। জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে গেলে বহুদিন আর বাড়ি ফিরতে পারেন না। একা একা থাকেন তখন আয়না খালা। বাড়িতে একজন কাজের বুয়া আর একজন দারোয়ান আছে—মোবারক আলি। বাড়িঘর পাহারা দেয়া থেকে বাজার করা, সব করে। ড্রাইভিংও জানে।

সময় কাটানোর জন্যে স্থানীয় একটা গার্লস হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন আয়না খালা। সমাজসেবা করে বেড়ান। একটা

মহিলা সংগঠনের তিনি সভানেত্রী।

সাগরের দিকে তাকিয়ে নানা কথা ভাবছে কিশোর। বাতাস বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে ঢেউয়ের গর্জন। গুমগুম, গুমগুম। নেশা ধরানো শব্দ। রোমাঞ্চিত করে শরীর।

কয়েক দিন আগের কথা মনে পড়ল ওর। স্কুল ছুটি। কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ভাবছে। এই সময় টেলিভিশনে দেখল ঘূর্ণিঝড়ের প্রতিবেদন। প্রলয়ঙ্করী ঝড় বয়ে গেছে বাংলাদেশের উপকূল দিয়ে। তছনছ করে দিয়েছে বাড়িঘর, গাছপালা। খুন হয়েছে লক্ষাধিক প্রাণ। দ্বীপগুলোতে খাবার, পানি আর ওষুধের অভাব প্রকট। দুর্গত সেসব অসহায় মানুষের জন্যে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে প্রতিবেদক।

তক্ষুণি ঠিক করে ফেলেছে কিশোর, বাংলাদেশেই যাবে। দুর্গতদের সাহায্য করতে। দেশের মানুষের সেবা করার এই সুযোগ কোনমতেই ছাড়বে না সে।

মুসা আর রবিনও তার সঙ্গী হওয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া। পরদিনই প্লেনের টিকেট কেটেছে ওরা। আমেরিকা থেকে ঢাকা, সেখান থেকে কক্সবাজারে এসে আয়না খালার বাড়িতে উঠেছে। দেখে খুশি হয়েছেন খালা। তবে তাঁর নীতি বড় কড়া। সাফ বলে দিয়েছেন, 'সেবা করবে ভেবে যখন এসেছ, তাই করো। সেবার নাম করে এসে পিকনিক করা চলবে না, অনেকেই যা করে থাকে।'

কক্সবাজারে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর। হাসপাতালে স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ার হিসেবে কিশোরকে তিনিই ঢুকিয়েছেন। রবিনকে পাইয়ে দিয়েছেন রেড ক্রসের অস্থায়ী স্টোর কিপারের কাজ। আর

মুসাকে বানিয়েছেন নিজের অ্যাসিসট্যান্ট। ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে সংগঠনের হয়ে দ্বীপ আর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। সঙ্গে থাকছে মুসা।

ত্রাণ নিয়ে বেরোলে কখন ফিরবেন তার কোন ঠিকঠিকানা থাকে না। এই তো, গতকাল সেই যে বেরিয়েছেন, রাত গেছে, আজ দিন গিয়ে আবার রাত হয়েছে, এখনও ফেরেননি। রাতে ফিরবেন কিনা ঠিক নেই। মহেশখালি দ্বীপে যাওয়ার কথা। ওখান থেকে আবার অন্য কোন দ্বীপে চলে গেছেন হয়তো। তাই দেরি হচ্ছে। এমনও হতে পারে, সাগরের অবস্থা ভাল না দেখে বোট ছাড়তে রাজি হচ্ছে না সারেঙ।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকল কিশোর। তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। কত কথা ভাবল। পাশের ঘরে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে রবিন।

পরদিন খুব ভোরে উঠল দুজনে। হাঁটতে গেল সৈকতে। এ সৈকত তাদের কাছে নতুন নয়। বহুবার এসেছে। তারপরেও প্রতিদিনই যেন নতুন লাগে। অন্য রকম। সূর্য ওঠা দেখতে পারল না। কারণ পুবের আকাশ ঢেকে আছে মেঘে। ঝোড়ো বাতাস বইছে। সাগরের ক্ষিপ্ততা বড় বেশি।

বাড়ি ফিরে গোসল সেরে নাস্তা করল। কাপড় পরে যখন বেরোল দুজনে আয়না খালা তখনও ফেরেননি।

যাই হোক, তাঁর ফেরা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না কিশোর। রিকশা নিয়ে রওনা হলো হাসপাতালের দিকে। রবিনকে স্কুলটার কাছে নামিয়ে দিয়ে একটা মার্কেটে যেতে বলল রিকশাওয়ালাকে।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

ছোট মার্কেট। নতুন হয়েছে। সৈকত থেকে বেশি দূরে না। কয়েকটা হোটেল আছে আশপাশে। দেশী-বিদেশী প্রচুর জিনিস পাওয়া যায় দোকানগুলোতে। পত্রপত্রিকা, বই থেকে শুরু করে তাজা ফুল, খেলনা, কাপড়চোপড়, টুথব্রাশ-সাবান-পাউডার, এমনকি ফলও পাওয়া যায়।

দিপুর কথা ভেবেই দোকানে ঢুকেছে কিশোর। বড় দেখে একটা কাপড়ের পুতুল কিনল। বাদামী রঙের ভালুক। দাম দিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। রিকশাওয়ালা বাইরে অপেক্ষা করছে। তাকে ক্যান্সার সেন্টারে যেতে বলল।

হাসপাতালে ঢুকে এলিভেটরের সামনে চলে এল। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে হাসপাতালটা বহুতল করার কথা চিন্তা করে এখন থেকেই এলিভেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিলড্রেন্স ফ্লোরে যাওয়ার জন্যে অস্থির। ভাবছে পুতুলটা দেখলে নিশ্চয় খুব খুশি হবে দিপু।

চার তলায় উঠে এল। ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে নার্স আর ওয়ার্ডবয়রা। রোগীদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আর কেবিনে ডিউটি দিচ্ছে। সকালের এ সময়টায় ওদের অনেক কাজ।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কিশোর, কোথাও নার্স সাফিয়াকে চোখে পড়ে কিনা। ও কেবিনে ঢুকছে দেখলেই বাগড়া দিতে আসবে।

কিন্তু দেখা গেল না ওকে। নিশ্চিন্ত মনে ১৭ নম্বর কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। দরজা ভেজানো। কান্নার শব্দ নেই। তারমানে এখনও ঘুমোচ্ছে দিপু। পুতুলটা দেখিয়ে ওকে চমকে দেয়ার জন্যে আস্তে দরজায় ঠেলা দিল। কিন্তু দরজা খুলে সে

নিজেই চমকে গেল।

বিছানা খালি। টেবিল ফাঁকা। ওষুধপত্র, ফ্লাস্ক আর অন্যান্য জিনিসপত্র যা ছিল, সাফ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেডের রেলিঙে মেডিক্যাল চার্টটাও নেই।

দুরুদুরু করতে লাগল কিশোরের বুক। অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। এখনও রোগী রিলিজ করা শুরু হয়নি। এত সকালে বিছানায় ও না থাকার একটাই মানে, মারা গেছে দিপু! রাতে কোন এক সময়। কাল বিকেলেও তো ভাল দেখে গেছে ছেলেটাকে। হঠাৎ কি ঘটল?

কেবিন থেকে বেরিয়ে নার্স স্টেশনের দিকে ছুটল সে। দিপুর কি হয়েছে ওখানে খোঁজ পাওয়া যাবে।

পর্দা সরিয়ে হলে উঁকি দিয়েই স্থির হয়ে গেল কিশোর। ফুসফুসে আটকে রাখা বাতাস ছেড়ে দিল সশব্দে। স্বস্তির নিঃশ্বাস। হাসি ফুটল মুখে।

ওই তো দাঁড়িয়ে আছে দিপু। মারা যায়নি। শক্ত করে ওর একহাত ধরে রেখেছে ওর মা। ওকে দেখে এতটাই খুশি লাগল কিশোরের, টুক করে গিয়ে ওর ফ্যাকাসে গালে একটা চুমু খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। লজ্জায় পারল না।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওকে রিলিজ দিল কিভাবে? স্টাফ ডাক্তার যিনি রিলিজ দেবেন তিনিই তো আসেননি। আসবেন এগারোটায়। জরুরী ভিত্তিতে অন্য কোন ডাক্তার দিতে পারেন অবশ্য, রোগীর অভিভাবক যদি বণ্ড সই দেয়। মনে হয় তাই দেয়া হয়েছে। ছেলেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে

উঠেছেন মা।

আরও একটা ব্যাপার অবাক করল ওকে। অরুণের সঙ্গে কথা বলছে দিপুর মা। বেশ কিছুটা দূরে নার্সের একটা ডেস্কের কাছে রয়েছে ওরা। কি বলছে এখান থেকে শোনা যাচ্ছে না। ওর অবাক হওয়ার কারণ, অরুণ এই তলায় কেন? ওর তো ডিউটি এখানে নয়। গতকালই ক্যান্টিনে খেতে বসে জানিয়েছে ওর ডিউটি থাকে সার্জিক্যাল ফ্লোরে। দিপুর মায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হলো কি করে? পাশাপাশি বাড়ি নাকি? কি কথা বলছে?

অরুণের সেদিনকার গেঞ্জিটায় লাল-কালো ডোরা। বুকে ইয়াবড় এক বাদুড়ের ছবি। আজব রুচি ওর।

আনমনে কথা বলতে বলতে ছেলের হাত ছেড়ে দিল মহিলা। দরজার দিকে ঘুরে তাকাল দিপু।

কয়েক পা এগোল কিশোর। হেসে ভালুকটা দেখিয়ে ভুরু নাচাল। উজ্জ্বল হলো দিপুর মুখ। চোখ দুটো নীরবে জিজ্ঞেস করল, 'আমার?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

মায়ের দিকে ফিরল দিপু। অরুণের সঙ্গে জরুরী কথা বলছে মা। এই সুযোগে আস্তে করে সরে এল দিপু। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল কিশোরের কাছে।

'নাও,' ওর হাতে পুতুলটা ধরিয়ে দিল কিশোর।

পুতুলটাকে জড়িয়ে ধরে ওটার নরম গায়ে গাল ঘষতে লাগল দিপু।

'পছন্দ হয়েছে?' হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল শুধু দিপু। কিছু বলল না।

'এটা তোমাকে প্রেজেন্ট করলাম। দেখে দেখে আমার কথা মনে কোরো।'

কিশোরের একটা হাত ধরল দিপু। ছাড়ার ইচ্ছে নেই।

'বাড়ি গেলেই ভাল লাগবে, দেখো। আর কান্না পাবে না। ওই যে, যাও, তোমার আম্মু ডাকছেন।'

মহিলার দিকে তাকাল দিপু। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। পানি টলমল করে উঠল চোখের কোণে। ফিসফিস করে বলল, 'ও আমার আম্মু না!'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

চার

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। দিপুর দিকে চাইল, 'কি বলছ? নিশ্চয় উনি তোমার আম্মু।'

মাথা নাড়ল দিপু, 'না, আম্মু না।'

'দিপু, এদিকে এসো!' ডাক দিল মহিলা। এই সময় কি যেন বলে আবার তাকে অন্যমনস্ক করে দিল অরুণ।

'আম্মু না? তাহলে কে উনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। অসুখে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ছেলেটার? উল্টোপাল্টা বকছে?

'আমি কিছু বলব না। তাহলে রেগে যাবে। মারবে আমাকে।'

'কেন রেগে যাবেন? উনি কে?'

মাথাটা ঝুলে পড়ল দিপুর। 'আমি বাড়ি যাব!'

'অ্যাই দিপু, ডাকছি যে কথা কানে যায় না? জলদি এসো!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিসেস ইসলামের কণ্ঠ। সে আর অরুণ দুজনেই তাকিয়ে আছে কিশোর ও দিপুর দিকে।

যেন যেতে ইচ্ছে করছে না এমন ভঙ্গিতে পা টেনে টেনে মহিলার দিকে এগিয়ে গেল দিপু।

তাকিয়ে আছে কিশোর।

ধমক দিয়ে দিপুকে কি যেন জিজ্ঞেস করছে মহিলা। অনুমান করতে পারল, ভালুকটার কথা কিছু বলছে। ওটাকে আরও শক্ত করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল দিপু। আবার কিশোরের দিকে তাকাল মহিলা। তারপর দিপুর এক হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল এলিভেটরের দিকে।

ভেতরে ঢুকে যাওয়ার আগে ফিরে তাকাল দিপু। ওর চোখে আবারও অনুনয়ের দৃষ্টি দেখতে পেল কিশোর।

অরুণের কাছে এসে দাঁড়াল সে।

পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে শুরু করল অরুণ।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এই ফ্লোরে?'

'ডাক্তার আকবর পাঠিয়েছেন। বাচ্চাদের তুমি খুব ভালবাস, না? ভালুকটা পেয়ে খুশি হয়েছে দিপু।'

'ওই মহিলা নিশ্চয় দিপুর মা?'

'তাই তো বলল।'

'তাই তো বলল মানে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল অরুণ।

'কি কথা বললে এত?'

'এই নানা রকম খোঁজখবর নিল। কক্সবাজারে নতুন এসেছে। লাইট হাউসটার অনেক পরে পাহাড়ের গোড়ায় বাসা নিয়েছে। ওখান থেকে সবচেয়ে কাছের ফার্মেসিটা কোথায় জিজ্ঞেস করল আমাকে। দিপুর জন্যে রাতবিরেতে ওষুধের দরকার হতে পারে।'

'ও।'

টেলিফোন বাজল। ঘুরে তাকাল কিশোর। এদিক ওদিক দেখল। কোন নার্সকে চোখে পড়ল না। ওরই ধরা উচিত। এগিয়ে গেল সেদিকে। রিসিভার তুলতে গিয়ে চোখ পড়ল ডেস্কের পাশে রাখা একটা তাকের দিকে। একটা বাক্সে মখমলের তৈরি খাঁজে তিনটে লম্বা ছুরির ওপর দৃষ্টি আটকে গেল। সার্জিক্যাল নাইফ। চকচক করছে স্টেনলেস স্টীলের তীক্ষ্ণধার ফলাগুলো। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল, 'হালো।'

ওপাশ থেকে প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, 'কে? অরুণ?'

'না, দিচ্ছি ওকে। ধরুন।'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অরুণ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখুনি আসছি, স্যার। সরি। এক রোগীর মা আটকে দিয়েছিল।'

ডাক পড়েছে অরুণের। আর কথা বলা যাবে না। দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর। বেরোনোর আগে কি মনে হতে ফিরে তাকাল।

ছুরির বাক্সটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরছে অরুণ।

থমকে গেল কিশোর।

ওর দিকে তাকানোর আর সময় নেই অরুণের। তাড়াহুড়া করে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

নিজের অজান্তেই মুখের কাছে হাত উঠে গেল কিশোরের। চিমটি কাটতে আরম্ভ করল নিচের ঠোঁটে। যে ভাবে বাক্সটা পকেটে ভরল অরুণ, তাতে মনে হয়েছে ছুরিগুলো চুরি করেছে সে।

ভাবতে ভাবতে করিডরে বেরিয়ে এল কিশোর।

হই-চই করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল কয়েকজন শ্রমিক আর মিস্ত্রী। পাশের দ্বিতীয় উইংটাতে কাজ করতে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এদিক দিয়ে ছাড়া যাওয়ার আর পথ নেই। নইলে এ ভাবে হাসপাতালে ঢুকতে দিত না ওদের।

শ্রমিকদের দিকে চোখ আর অন্যমনস্ক থাকায় নার্স বিশাখা গোমেজকে নার্স স্টেশনে ঢুকতে দেখল না সে। ফোনের শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখে ফোন তুলছে বিশাখা।

ছুরিগুলোর কথা বলা দরকার। এগিয়ে গেল কিশোর।

নাক কুঁচকে কথা বলছে বিশাখা, 'বলো কি? আরও? হায়রে পয়সা! কেউ ভাত পায় না, আর কেউ খেলনার পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করে···ঠিক আছে, লোক পাঠাচ্ছি।···হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সামনেই একজন ভলান্টিয়ার দাঁড়িয়ে আছে।'

রিসিভার রেখে দিল সে। আনমনে বিড়বিড় করে মাথা নাড়তে থাকল।

কিশোর বলতে গেল, 'সিসটার...'

কথা শেষ করতে দিল না বিশাখা। 'কিশোর, রিসিপশনে যাও তো। পনেরো নম্বর ঘরের জন্যে আরেকটা প্যাকেট রেখে গেছে। নিয়ে এসোগে। কাণ্ড! খেলনাগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যেই একটা ট্রাক লাগবে!'

বিরক্ত লাগল কিশোরের। হাসপাতালে এই হলো ভলান্টিয়ারের কাজ! ফাইফরমাশ খাটা। সারাদিন ধরে এটা-ওটা আনা নেয়া করা, রোগীদের আবদার শোনা, ডাক্তার-নার্সদের কাজ করে দেয়া, এই সব। ফালতু। তার চেয়ে আয়না খালার সঙ্গে অপারেশন ব

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

থেকে মুসার মত ত্রাণ বিতরণ করে বেড়ানো অনেক ভাল ছিল। দোষটা ওরই। ও ভেবেছিল হাসপাতালের কাজ, বৈচিত্র থাকবে, তাই এখানে ভলান্টিয়ার হওয়ার ওপর জোর দিয়েছিল। ওরা যে ওকে বয়ের মত খাটাবে, কল্পনাও করতে পারেনি।

কাজটা হয়তো সেদিন করেই ছেড়ে দিত কিশোর, কিন্তু দিপুর রহস্যটা হাসপাতাল ছাড়তে দিল না ওকে। তার ধারণা, বিপদের মধ্যে আছে ছেলেটা। ওর জন্যে কিছু করা দরকার। বিপদটা কেমন জানা থাকলে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু কি করে জানবে?

একটাই উপায়, ওর কাছে যেতে হবে। কথা বলতে হবে। ঠিকানা পাবে কোথায়? অরুণকে জিজ্ঞেস করে জানা যায়। কিন্তু ও যদি জিজ্ঞেস করে দিপুর ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন কিশোরের? তা ছাড়া আরও একটা কারণে অরুণকে জিজ্ঞেস করার পক্ষপাতি নয় ও—ছুরি চুরি করার পর থেকে ওকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে সে। কোথায় যেন একটা খটকা আছে।

নার্স স্টেশনের পেছনে একটা ছোট অফিসে রোগীদের রেকর্ড রাখা হয়। ডাক্তার আর নার্স বাদে অন্য কারও ওখানে ঢোকা বারণ। কিশোর ঠিক করল, ও ঢুকবে। অফিসের ফাইলে পাওয়া যাবে ঠিকানা।

বিকেলে যখন নার্সদের শিফট বদল হয়, দ্বিতীয় উইঙের কাজ সেরে শ্রমিকেরা বেরিয়ে যেতে থাকে, একটা গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখনই ঢোকার উপযুক্ত সময়। কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।

সুযোগের অপেক্ষায় রইল কিশোর। পেয়ে আর এক মুহূর্ত

দেরি করল না। ঢুকে পড়ল।

ছোট ঘরটায় গাদাগাদি হয়ে আছে ফাইল, কাগজপত্র। ধুলো জমে আছে। বাতাস বদ্ধ। শব্দ শুনে যদি কেউ টের পেয়ে যায় এই ভয়ে ফ্যান ছাড়ারও সাহস পেল না। তবে দিপুর ফাইলটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না ওর।

ঠিকানা মুখস্থ করে নিয়ে আবার আগের জায়গা রেখে দিল ওটা। প্রশ্ন হলো, যাবে কি করে ওবাড়িতে? মিসেস ইসলামকে মোটেও মিশুক মনে হয়নি। সরাসরি বাড়িতে ঢুকে দিপুর সঙ্গে কথা বলা যাবে না। বাইরের কারও সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেবে কিনা মহিলা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, টিকেট। রেড ক্রসের টিকেট বিক্রি করে চাঁদা তোলার ছুতোয় যেতে পারে। রবিনের কাছ থেকে একটা টিকেট বুক চেয়ে নিলেই হবে।

একা যাবে? যাওয়া যায়। রবিনের সময় থাকলে ওকে নিয়েও যাওয়া যায়। আর ইতিমধ্যে যদি মুসা ফিরে আসে তাহলে তিনজনে মিলেই যাবে।

ঘড়ি দেখল কিশোর। প্রায় পনেরো মিনিট কাটিয়েছে অফিসটাতে। শিফট বদল হয়ে গেছে নিশ্চয় ইতিমধ্যে। আলো নিভিয়ে আস্তে করে ভেজানো দরজাটা ঠেলে ফাঁক করতেই কানে এল হেড নার্স আনোয়ারা বেগমের কণ্ঠ। জোরে জোরে বলছে, 'সাফিয়া, এত দেরি করলে কেন? শিকদার স্যার তো চটেমটে অস্থির। তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। সতেরো নম্বরে নতুন রোগী এসেছে।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

নার্স সাফিয়াকে ডেস্কের দিকে এগোতে দেখল কিশোর। এদিকেই চোখ। তাড়াতাড়ি দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। আনোয়ারা বেগম খুব কড়া মহিলা। আর সাফিয়া হচ্ছে বদমেজাজী। অফিস থেকে চুরি করে বেরোনোর সময় কোনমতেই ওই দুজনের সামনে পড়তে চায় না সে। প্রশ্ন করলে কোন জবাব নেই।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

পাঁচ

কান পেতে আছে কিশোর। কথা থামছে না হলরুমে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে ভাবল সে, দূর, কিসের এত ঘোড়ার ডিমের ভয়? ধরা পড়লে কাজ বাদ দিয়ে চলে যাবে। সে এখানে চাকরি করতে আসেনি। বিনে পয়সার ভলান্টিয়ারি। লাভটা ওদেরই। বিনে পয়সায় খাটানোর লোক পেয়ে গেছে। কিন্তু আয়না খালার টিটকারির কথা ভেবে দমে গেল আবার। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, হাসপাতালে দুদিনও টিকতে পারবে না কিশোর। চ্যালেঞ্জ করেছিল সে। এখন বেরিয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে হেরে যাওয়া। একটা জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে কিশোর—পরাজয়। অতএব এত তাড়াতাড়ি হার স্বীকার করতে চাইল না সে। দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু কতক্ষণ? ভীষণ গরম লাগছে। বার বার হাতের মুঠো খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল। নাহ্, আর সহ্য করতে পারছে না। দরজাটা ফাঁক করলে কিছুটা বাতাস আসবে। নার্সেরা কি করছে, তাও দেখতে পারবে। সুযোগ বুঝে ওদের অলক্ষে চট করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করতে পারবে।

আনোয়ারা বেগম বেরিয়ে গেছে। নার্স স্টেশনে একা নার্স সাফিয়া। একটা চার্ট দেখল। বাস্কেটে রাখা কয়েকটা কাগজ তুলে দেখার সময় একটা কাগজ হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। সেটা তোলার জন্যে নিচু হয়ে মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে হলো ডেস্কের নিচে। দরজা খুলে বেরোলে এখন দেখতে পাবে না কিশোরকে।

এইই সুযোগ। একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না সে। বেরিয়ে এসে দৌড় দিল একটা ডেস্কের পাশ দিয়ে।

কিন্তু ফাঁকি দিতে পারল না। মাথা তুলে ফেলেছে সাফিয়া। দেখে ফেলল ওকে। চিৎকার করে ডাকল, 'অ্যাই, কে? কে তুমি?'

শুধু পেছনটা দেখে মনে হলো চিনতে পারেনি। তাই থামল না কিশোর।

'এই, দাঁড়াও!'

দাঁড়াল না কিশোর। নার্স স্টেশনে ঢুকছে একজন রোগীর আত্মীয়। আরেকটু হলে তার গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে ফেলে দিয়েছিল তাকে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সাফিয়া। জুতোর খটাখট শব্দ তুলে ছুটে আসতে শুরু করল পেছনে।

করিডর ধরে ছুটল কিশোর। বাঁক নিয়ে এগোল। সামনে দেয়াল। যাওয়ার জায়গা নেই। একপাশে একটা এলিভেটর। অনেক বড়। সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে নয়। এমনকি ভলান্টিয়ারদেরও নয়। ভারি জিনিসপত্র যেমন স্ট্রেচার, রোগীর বেড এক তলা থেকে অন্য তলায় নেয়ার প্রয়োজন হলে ওটা দিয়ে ওঠানো-নামানো হয়। এইমাত্র একটা অপারেশন টেবিল ওঠানো

হয়েছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা। সাফিয়াকে ফাঁকি দেয়ার আর কোন উপায় না দেখে হুড়মুড় করে তাতে ঢুকে পড়ল কিশোর।

ও ঢোকার আগেই বোতাম টিপে দিয়েছে অপারেটর। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পিছাতে গিয়ে টেবিলে ধাক্কা খেল কিশোর। এক মহিলাকে তাতে চিত করে শোয়ানো। চোখ বোজা। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য মুখ। পায়ের কাছে রাখা মনিটরিং মেশিন ঝিরঝির করে চলছে। থেকে থেকে বীপ বীপ করে উঠছে। অক্সিজেন বোতল থেকে পাইপ চলে গেছে নাকের ভেতর। দণ্ডে ঝোলানো স্যালাইনের বোতলের সরু নল ঢুকে গেছে মহিলার গায়ের চাদরের নিচে। জরুরী অপারেশন করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বোধহয়।

কিশোরের গায়ের ধাক্কা লেগে দুলে উঠল দণ্ডে ঝোলানো বোতল।

ধমকে উঠল অপারেটর, 'আরে করছ কি? ফেলবে তো! তুমি এতে ঢুকেছ কেন?'

'এটা দিয়ে নামা কি নিষেধ?'

'থামিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুণি নামো। চাকরিটা খাবে আমার,' গজগজ করতে করতে বোতাম টিপে দিয়ে ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল অপারেটর।

মৃদু একটা ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল এলিভেটর। দরজা ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল কিশোর। চোখ পড়ল একটা দরজার দিকে। লেখা রয়েছে:

নিষিদ্ধ এলাকা

অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া ঢোকা নিষেধ

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

বাপরে! কি বাংলা! কেন যে এরা এ ভাবে ইংরেজির অনুবাদ করতে যায়। তার চেয়ে বক্তব্যটা সহজ বাংলায় লিখে দিলেই পারে।

পেছনে বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা। চারপাশে তাকাতে লাগল সে। কোন করিডর নয় এটা। বিশাল এক হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের একপাশের দেয়াল ঘেঁষে নেমেছে এলিভেটরের শ্যাফট। আলো খুব কম। প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে ঘরটা। নিঝুম, নির্জন।

এখানে কখনও আসেনি আর সে। আসবে কি? ভলান্টিয়ারি করার পর কি সময় পায় নাকি। বিশাল হাসপাতালের অনেক জায়গাই তার অদেখা এখনও।

সাধারণ মেডিকেল ওয়ার্ডের মত লাগছে না ঘরটাকে। এ কোথায় ঢুকল? বেরোবে কি করে?

দ্বিধায় পড়ে গেল সে। সরে যেতে শুরু করল এলিভেটরের দরজার কাছ থেকে। শ্যাফটের ভেতরে একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ হতে ফিরে তাকাল। দরজার ওপরের লাল বাতিগুলো এলিভেটরের অবস্থান নির্দেশ করছে। ওপরে উঠছে আবার ওটা। নিচে রোগিণীকে পৌঁছে দিয়ে আবার ওপরে যাচ্ছে। নিশ্চয় বোতাম টিপেছে কেউ। কয় তলায় থামে দেখার জন্যে দাঁড়াল কিশোর। চার তলায় থামল।

তারমানে নার্স সাফিয়া। এলিভেটরের দরজার ওপরের সিগন্যাল লাইট দেখে জেনে গেছে কোন ফ্লোরে নেমেছে কিশোর। তার পিছু নিতে আসছে এখন। ও নেমে আসার আগেই

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

পালাতে হবে।

অন্ধকার হল ধরে ছুটল কিশোর। কোন্ দিক দিয়ে বেরোবে জানে না। প্রতিটি বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখতে লাগল খোলে কিনা। সবগুলোতে তালা লাগানো। সিঁড়িটা কোথায়? কিংবা আরেকটা এলিভেটর যেটা দিয়ে সবাই নামতে পারে?

একটা অন্ধকার কোণে এসে থমকে দাঁড়াল। কে যেন ঘাপটি মেরে বসে আছে। নড়ছে না।

ভাল করে দেখতে গিয়ে আরেকটু হলেই হেসে ফেলেছিল। একটা বালতি। পাশে মেঝে মোছার জন্যে পাট দিয়ে তৈরি ঝাড়ন।

পানির বালতি আর ঝাড়ন ফেলে কোথায় গেল ঝাড়ুদার? ছুটি হয়ে গেছে? নাকি বাথরুমে?

মাথা ঘামাল না কিশোর। দৌড় দিল দেয়াল ঘেঁষে।

ঘরটা অনেকটা করিডরের মতই লম্বা। বাঁক আছে। দেয়ালের একটা মোড় ঘুরে অন্যপাশে আসতে একটা দরজা চোখে পড়ল। ওপাশে কেউ আছে কিনা জানে না। ওকে দেখলে চেঁচামেচি শুরু করতে পারে। করুক, কেয়ার করে না। বরং জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে কোনদিক দিয়ে বেরোতে হয়। যা ঘটে ঘটুক, নার্স সাফিয়া ওকে দেখে চিনে না ফেললেই হলো।

দরজার নব ধরে মোচড় দিল সে। ঘুরল ওটা। ঠেলা দিতে খুলে গেল পাল্লা।

ঢুকে পড়ল কিশোর। সাংঘাতিক ঠাণ্ডা ঘর। মুহূর্তে কাঁপ ধরে গেল ওর। রাসায়নিক পদার্থের তীব্র গন্ধ বাতাসে। দম আটকে আসে। আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে আসার অপেক্ষায় রইল সে।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে অস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠল কয়েকটা ধাতব উঁচু পায়াওয়ালা টেবিলের অবয়ব। সারি দিয়ে রাখা। মাঝখান দিয়ে গলিপথ। তার ভেতর দিয়ে এগোতে শুরু করল সে। ছুঁয়ে দেখতে গেল একটা টেবিলের ধার। ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনল হাত। বরফের মত ঠাণ্ডা।

পা পড়ল মেঝেতে জমে থাকা পানিতে। অবাক কাণ্ড! ঘরের মধ্যে পানি জমল কিভাবে? পিছলে গেল পা। পড়ে যাচ্ছে। কিছু একটা ধরে বাঁচার জন্যে থাবা মারল।

হাতে ঠেকল টেবিলে রাখা একটা মসৃণ, শক্ত, বরফের মত শীতল জিনিস।

বুঝে ফেলল জিনিসটা কি। মরা মানুষ। লাশের কাঁধ খামচে ধরেছে সে।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

ছয়

ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে আনল কিশোর। কোথায় আছে বুঝে ফেলেছে।

লাশকাটা ঘর!

সেজন্যেই এত ঠাণ্ডা। বাতাসে রাসায়নিকের কড়া গন্ধের মানেও এখন জানা। ফরমালডিহাইড। মৃতদেহ পচন থেকে রক্ষা করার জন্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে মানুষের দেহ কাটাছেঁড়া করা হয়। লাশ কেটে হাত পাকায় মেডিকেলের ছাত্ররা।

চোখে অন্ধকার পুরোপুরি সয়ে এসেছে এখন। চারদিকে তাকিয়ে অসংখ্য লাশ দেখতে পেল সে। টেবিলে শোয়ানো। কোনটা আস্ত, কোনটা কাটা।

ভয়াবহ এই জায়গায় আর একটা মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে হলো না ওর। ঘুরে রওনা দিল দরজার দিকে। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরোতে পারে, বাঁচে।

বাইরে পদশব্দ কানে আসতে থমকে দাঁড়াল। নার্স সাফিয়া কি পৌঁছে গেছে?

সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজার পাল্লা। চাবির গোছার ঝনঝন

শব্দ। তালা লাগিয়ে দেয়া হলো বাইরে থেকে। পদশব্দ সরে যাচ্ছে।

জানোয়ারের মত একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে দৌড় দিল।

পা বাধল কিসে যেন। ওর গায়ের ওপর পড়ল ওটা। কঠিন একটা বাহু গলা পেঁচিয়ে ধরল।

চিৎকার করে গা ঝাড়া দিল সে। মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে খটাখট করে উঠল সাদা একটা জিনিস। কঙ্কাল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। ওর পা লেগে পড়েছে।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে আসতে গিয়ে হাতে লাগল ঠাণ্ডা কি যেন। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে টেবিলে শোয়ানো একটা লাশের হাত। শুধু ধড় আছে লাশটার, মাথাটা কাটা। খাড়া করে মাথাটা বসিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। চোখ বোজা। বিকট ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে দাঁতগুলো। কপাল থেকে পেছনের দিকে চুল অর্ধেক চাঁছা। সাদা হয়ে আছে রক্তহীন খুলির চামড়া।

বীভৎস এ সব দৃশ্য আর সওয়া যায় না। বেরোনো দরকার। জোরে জোরে থাবা মারতে শুরু করল দরজায়। বাইরে যেই আছে, থাক। নার্স সাফিয়া হলেও আর পরোয়া করে না। এতক্ষণে মনে হলো, দেখলে কি করবে ও? বড় জোর নালিশ করবে নার্স সুপারভাইজার কিংবা শিফট-ইন-চার্জের কাছে। ওরা ওকে ধরে খেয়ে ফেলবে না। ওই মহিলার ভয়ে পালাচ্ছিল বলে নিজের ওপরই রাগ হলো এখন। আসলে হাসপাতাল জায়গাটাই এমন, সবচেয়ে সাহসী মানুষকেও কেমন যেন করে ফেলে। স্নায়ুর জোর

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

কমিয়ে দিয়ে ভীতু করে তোলে।

কিল মেরে, ধাক্কাধাক্কি করে অনেক চিৎকার করল। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না দরজা খুলে দিতে। কারও কানে পৌঁছল না তার চিৎকার।

ঠাণ্ডা দরজার গায়ে কপাল ঠেকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পুরো পনেরো সেকেণ্ড।

এই সময় মনে হলো আরও কেউ আছে এই ঘরে। মনে হলো নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে।

ঝট করে ফিরে তাকাল।

কই? কিছুই তো নেই।

আবছা অন্ধকারে ভালমত দেখার জন্যে টান টান করতে গিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল। স্তব্ধ হয়ে আছে পুরো ঘর। কোন কিছুই তাকে ধরার জন্যে এগিয়ে আসছে না। ধাতব টেবিলগুলোতে স্থির হয়ে আছে লাশগুলো। নড়ছে না কোনটাই।

ভূতপ্রেতে একটুও বিশ্বাস নেই ওর। সত্যি যদি কেউ থাকে, তাহলে লাশ নয়, জীবন্ত কোন মানুষ। আর তা নাহলে সব ওর মনের ভুল। হঠাৎ করে লাশকাটা ঘরে ঢুকে পড়ার ভয়ে সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে মাথার মধ্যে।

যখন খেয়াল করল, নিঃশ্বাসের শব্দটা ওর নিজেরই—নাক দিয়ে বেরোনো বাতাস দরজার পাল্লায় বাড়ি খেয়েছিল বলে নীরবতার মধ্যে আরেক রকম লেগেছে, ধমক লাগাল মনকে। ভয় পেলে ভাবনা গুলিয়ে যায়। আর গুলোলে এখান থেকে বেরোনোর উপায় বের করতে পারবে না।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ঘন ঘন কয়েকবার টিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। দ্রুত শান্ত হয়ে আসছে অস্থির মন। ভাবল, কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে ওকে এখানে? দিনের বেলা কাজ করেছে এখানে ছাত্ররা। বিকেলে ও ঢোকার খানিক আগে বেরিয়েছে। আসতে আসতে আবার কমপক্ষে আগামীকাল সকাল দশটা। ততক্ষণ এই ভয়াবহ ঘরটার মধ্যে আটকে থাকতে হবে ওকে। নিশ্চয় বেরোনোর আর কোন পথ নেই। থাকলে বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়ে যেত না দারোয়ান।

বাইরে থেকে? পলকে ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়। নবের তালা আটকে দিলে বাইরে থেকে চাবি ছাড়া খোলা যায় না বটে, কিন্তু ভেতর থেকে যায়। ইস্, এই সহজ কথাটা মনে ছিল না!

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল নবটা। এক মোচড় দিতেই কিট করে খুলে গেল লক। পাল্লা খুলতে দেরি হলো না। বাইরে বেরিয়ে এল সে। দরজাটা লাগানোরও প্রয়োজন বোধ করল না আর। হাঁ করে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল। আহ্, কি আরাম! ফরমালডিহাইডের জঘন্য গন্ধ নেই।

লাশকাটা ঘর থেকে বেরিয়েও আবার সেই আগের সমস্যা—এই ফ্লোর থেকে বেরোবে কি করে? দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে আরম্ভ করল। ভালমত না দেখে আর কোন দরজা দিয়ে হুট করে ঢুকে পড়বে না। একবারেই শিক্ষা হয়েছে।

ঘরটা L প্যাটার্নের। L-এর এক প্রান্তে পৌঁছতেই একটা করিডর দেখতে পেল। সামনের দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে গেল যেন হোঁচট খেয়ে।

এলিভেটরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নার্স সাফিয়া। সঙ্গে লম্বা আরেকজন লোক। গায়ে সাদা ল্যাব কোট। সিকিউরিটি গার্ড নয়। ওরা ছাই রঙের ইউনিফর্ম পরে। এই লোকটা ডাক্তার।

পেছন থেকে দেখে লোকটাকে চিনতে পারল না কিশোর। ওকে ধরার জন্যে একজন ডাক্তারকে ডেকে এনেছে সাফিয়া? ডাকা উচিত ছিল সিকিউরিটিকে। নিদেন পক্ষে দারোয়ান, পিয়ন কিংবা কোন ওয়ার্ডবয়ের সাহায্য নিতে পারত। চোর ধরার জন্যে ডাক্তার ডাকাটা মোটেও স্বাভাবিক নয়।

পিছিয়ে এল আবার কিশোর। ছায়ায় গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা কি করে দেখছে।

কথা বলছে দুজনে। কি বলছে দূর থেকে বোঝা গেল না।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। তাতে ওঠার সময় মুখটা এদিকে ঘোরালেন ডাক্তার। ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। ডাক্তার শিকদার হেমায়েত হোসেন। শিশু বিশেষজ্ঞ। এই হাসপাতালের শিফট-ইন-চার্জ। আশ্চর্য! পলাতক এক স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারকে ধরার জন্যে এত বড় একজন ডাক্তারকে ডেকে আনল সাফিয়া?

নাহ্, ব্যাপারটা আসলে তা নয়—নিজেই নিজেকে জবাব দিল কিশোর। ওকে খুঁজে না পেয়ে সাফিয়া এলিভেটরের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময় ডাক্তার সাহেবও সেখানে এসেছেন এলিভেটর ব্যবহারের জন্যে। অপেক্ষা করার সময় দুজনে কথা বলাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। তিনি চাইল্ড স্পেশালিস্ট, সাফিয়া চিলড্রেন্স ফ্লোরে ডিউটি দেয়। তা ছাড়া তিনি শিফট-ইন-চার্জ। নার্সদের ডিউটি ভাগ করেন। তাঁর সঙ্গে একজন নার্স কথা বলতেই পারে।

অকারণ সন্দেহ। মনে মনে নিজেকে বকা দিল কিশোর।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সাফিয়া আর ডাক্তার দুজনেই চলে গেলেন।

এলিভেটরের অপেক্ষায় রইল না কিশোর। করিডর যখন পাওয়া গেছে, সিঁড়ি খুঁজে পেতেও আর অসুবিধে হবে না।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

সাত

বাড়ি ফেরার আগে রবিনের সঙ্গে দেখা করল কিশোর। সব কথা জানাল ওকে। শুনে রবিনও একমত হলো—দিপুর ব্যাপারটা রহস্যময়। নিজের মা হলে দিপু তাকে মা বলবে না কেন? ওর বয়েসী একটা ছেলে চালাকি করে মিথ্যে বলেছে এটাও হতে পারে না।

রবিনও বলল, সত্যি কথাটা জানতে হলে দিপুদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। তারও ডিউটি শেষ। বেরিয়ে পড়ল কিশোরের সঙ্গে।

বাড়ি এল প্রথমে দুজনে। আয়না খালা আর মুসা ফেরেনি। আকাশের অবস্থা ভাল না। মেঘ করেছে। সাগরে ঢেউয়ের দাপাদাপি একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে। বোধহয় সেজন্যেই আসতে পারছে না। কিংবা চলে গেছে বহুদূরে কোথাও। যাই হোক, ওদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না কিশোর।

বাগানে ফুলগাছের মরা ডাল কাটছে মোবারক। একবার তাকিয়ে নীরব একটা হাসি দিয়ে আবার কাজে মন দিল।

কাজের বুয়া ওদের চা-নাস্তা বানিয়ে দিল।

হাতমুখ ধুয়ে, নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার দুই গোয়েন্দা। দিপুদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে একটা রিকশা নিল।

কোথায় যাবে ওরা শুনেই আঁতকে উঠল রিকশাওয়ালা। ওদের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে। কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় বলল, 'হেদিকে যে যাইবেন, জানেন কি আছে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। কি আছে?'

'কবর।'

'তাতে কি?'

'খিরিস্টানরার কবর।'

'তাতেই বা কি?'

'অনেক পুরান কবর কইলাম। হেই যে বিটিশ আমলে ডাকাইতরা আইত জাহাজে কইরা, হেরার কবরও আছে। পুরানা বাড়ি আছে। চাইর পাশে জঙ্গল। আগে বাঘ থাকত। অহন অবশ্য নাই। তয় ভূত আছে।'

হেসে ফেলল কিশোর। 'থাকলে থাক। মানুষ তো বাড়িঘর বানিয়ে থাকছে ওখানে। ভূতে ওদের কিছু না করলে আমাদের করবে কেন?'

জবাব দিতে না পেরে রেগে গেল রিকশাওয়ালা। চুপ করে গেল।

ছোকরাটাকে ওর ভাল লেগেছে। তাই জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমার নাম কি?'

'হিরণ মিয়া।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

'এ শহরে কদ্দিন আছো?'

'এক বছর। আগে ডাহা (ঢাকা) রিকশা চালাইতাম। পয়সা ওইহানে ভালই পাওয়া যায়। কিন্তু যে যানজট আর রাস্তার পানি। কাবু অইয়া ভাইগ্যা আইছি। পুলিশেও বেজান পিডান পিডায়। ইহানে পয়সা অত নাই, তবে যন্ত্রণাও অত নাই। কষ্ট কম।'

'তারমানে এই শহরের সব জায়গাই তুমি চেনো,' রবিন বলল।

'চিনমু না ক্যান? ছুডু (ছোট) শহর, ডাহার তুলনায় এক্কিরে ছুডু। দুই দিনও লাগে না সব চিনতে।'

হিরণ মিয়া থাকাতে ঠিকানা খুঁজে বের করতে তেমন অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। একটা কথা ঠিক বলেছে রিকশাওয়ালা, রাস্তাটা দেখলে ভূতুড়েই মনে হয়। মেঘলা আকাশ। সন্ধ্যা লাগে লাগে। এ সময় জায়গাটাতে ঢুকেই গা ছমছম করতে লাগল ওদের। যদিও কোন কারণ নেই, ভূতুড়ে ঘটনা ঘটল না। এক পাশে পাহাড়। ঘন ঝোপঝাড়। মনে হয় কি যেন রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। বাড়িঘরগুলোর অনেক পেছনে বন।

'রাস্তাটার নাম কি, হিরণ মিয়া?' জানতে চাইল রবিন।

'আফনে কিন্তুক খুব বালা বাংলা কন, সা'ব। দেকতে তো দেহা যায় বিদেশীরার লাহান।'

হাসল রবিন, 'ছোটবেলা থেকে বাঙ্গালীর সঙ্গে ওঠাবসা। কয়েকবার বাংলাদেশে এসে থেকে গেছি। বাংলা শেখা আর কঠিন কি। রাস্তাটার নাম কি?'

'এই রাস্তার কোন নাম নাই। আমি রাখছি ভূতের গলি।'

'বাহ্, ভাল নাম। মানিয়েছে।' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'ঢাকাতে একটা ভূতের গলি আছে না?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই হিরণ মিয়া বলল, 'হ, আছে। ওইডা ভূতের গলি না, অহন অইল মাইনষের গলি। বাপরে বাপ, যা ঘিঞ্জি। মাইনষের ঠেলায় মানুষই পলায়, আর ভূত থাকব কেমনে? এই যে দ্যাহেন না আমি পলাইয়া আইছি। ভূতের গলির কাছে বস্তিত থাকতাম।'

'ও, এইজন্যেই ভূতের গলি নামটা চট করে মাথায় এসে গেছে তোমার,' হেসে বলল কিশোর। আশপাশে তাকাতে তাকাতে বলল, 'সত্যি, নামটা মানানসই। তোমাকে তো খুব বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে হে। লেখাপড়া জানো নাকি?'

'হ। কেলাস ফাইভ পইর্যন্ত পড়ছি। পড়নের ইচ্ছা আছিল আরও। কইত্তে পড়মু? এগারোজন বাই-বইন। বাপে খাওয়াইব কইত্তে?'

'বাড়ি কোথায়? কুমিল্লার দিকে নাকি?'

হাসিতে দাঁত সব বেরিয়ে পড়ল হিরণ মিয়ার। 'আফনে জানলেন কেমনে?'

'তোমার ভাষা শুনে।'

মোড় নিল পথটা। দ্রুত কমে যাচ্ছে আলো। পাহাড়ের ঢালে এক জায়গায় ঘন ঘাসের মধ্যে দু'চারটা পুরানো পাথর বেরিয়ে থাকতে দেখা গেল। হিরণ মিয়া জানাল, ওটাই পুরানো গোরস্থান।

কয়েক মিনিট চুপচাপ রিকশা চালানোর পর একটা বহু পুরানো বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'আফনেরা মনে হয় অই বাড়িডারঅই খোঁজ করতাছেন?'

পাকা বাড়ি। ওপরে টিনের চাল। ইংরেজ আমলে তৈরি

করেছিল হয়তো কোনও বিদেশী। তারপর এ দেশীদের দখলে চলে গেছে। তবে বিশেষ যত্ন নেয় না। সামনে বড় বাগান ছিল এককালে। এখন তার চিহ্ন আছে কেবল।

'রাখো তো গেটের সামনে,' কিশোর বলল।

রঙচটা কাঠের গেটের সামনে রিকশা দাঁড় করাল হিরণ মিয়া। কোমর থেকে গামছা খুলে মুখের ঘাম মুছতে শুরু করল। 'আফনেরা কি কুনু কামে যাইবেন ওই বাড়িত? না বেড়াইতে আইছেন?'

'কাজেই এসেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'একজন পরিচিত মহিলা থাকেন ওবাড়িতে। তার সঙ্গে দেখা করব। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমরা আসছি।'

গেটের ভেতরে ঢুকে ঘাসে ঢাকা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন, 'শহরে এত বাসাবাড়ি থাকতে এই জঙ্গলের ধারে থাকতে এল কেন মহিলা? তাও অসুস্থ একটা বাচ্চা নিয়ে?'

'ফিসফিস করছ কেন? ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'না, তা পাচ্ছি না। অস্বস্তি লাগছে।'

কান পাতল কিশোর।

'কি হলো?' জানতে চাইল রবিন।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'শুনলে না? বাচ্চা ছেলের চিৎকারের মত লাগল।'

'আমার তো মনে হলো বেড়ালের চিৎকার।'

'উঁহুঁ! মানুষ।'

পুরানো আমলের বাড়ি। উঁচু বারান্দা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দুজনে বারান্দায়। দরজার পাশে কলিং বেলের বোতাম দেখতে

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

পেল না। দরজায় টোকা দিল কিশোর।

সাড়া নেই।

জোরে থাবা দিয়ে ডাকল, 'কেউ আছেন?'

পায়ের শব্দ এগিয়ে এসে থামল দরজার সামনে। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল একটা মহিলাকণ্ঠ, 'কে?'

'আমরা।'

'আমরা কে?'

'রেড ক্রস থেকে এসেছি। ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্যে টিকেট বিক্রি করতে।'

ছিটকানি খোলার শব্দ হলো। সামান্য ফাঁক হলো দরজা। সেই মহিলাই, মিসেস ইসলাম, চিনতে পারল কিশোর। কিন্তু ভলান্টিয়ারের পোশাক খুলে আসায় ওকে বোধহয় চিনতে পারল না মহিলা। ভুরু কুঁচকে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'আমরা স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ার,' লেকচার শুরু করল কিশোর। 'এই যে এত এত লোক, অসহায় হয়ে পড়ে আছে কেউ হাসপাতালে, কেউ বাড়িতে, খেতে পাচ্ছে না, রোগেশোকে কাহিল...'

'হয়েছে হয়েছে, থামো!' হাত তুলল মহিলা, 'ওসব আমি জানি। আমি টাকা দিলেই বা আর কত দেব? ওতে কার কি উপকার হবে?'

'আপনার একটা টাকাও অনেক, ম্যাডাম। টাকা টাকা করে জমিয়েই তো শ হয়, শ থেকে হাজার...'

'বড় বেশি কথা বলো তুমি। দাঁড়াও।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

দরজাটা ফাঁক রেখেই ভেতরে চলে গেল মহিলা। উল্টোদিকের আরেকটা দরজা দিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে গেল।

কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'এই মহিলাই?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

দাঁড়িয়েই আছে ওরা। মহিলা আর আসে না। অন্ধকার প্রায় হয়ে গেছে। বড় বড় কালো মেঘের স্তর ভেসে যাচ্ছে আকাশে। যে কোন সময় বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করবে। বৃষ্টি নামবে। ঝড়ও হতে পারে।

পাহাড়ের দিকে তাকাল রবিন। পুরানো গোরস্থানটা চোখে পড়ে এখান থেকে। গায়ে কাঁটা দিল ওর। 'এত দেরি করছে কেন?'

কিশোর বলে উঠল, 'এবার শুনেছ? বেড়াল নয়!'

রবিনও শুনতে পেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কোন বাচ্চা ছেলে। 'হ্যাঁ।'

পাল্লাটা ঠেলে পুরো ফাঁক করে ফেলল কিশোর। ঘরে আসবাবপত্র প্রায় কিছুই নেই। গোটা কয়েক পুরানো চেয়ার বাদে। উল্টোদিকে তো দরজা আছেই, মহিলা যেটা দিয়ে ঢুকেছে; এ ছাড়াও একপাশে আরও একটা দরজা। খোলা। কান্নার শব্দ আসছে ওটা দিয়ে।

ঢুকে দেখবে নাকি? দ্বিধা করতে লাগল কিশোর।

ঠিক এই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল ছেলেটা। দিপু। খালি পা। পরনের পাজামাটা ওর মাপের চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। চোখ ডলে ডলে কাঁদছে। আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। অনেক বেশি

বিধ্বস্ত লাগছে ওকে। কয়েক ঘণ্টায় কি এমন ঘটেছে যে এত খারাপ অবস্থা হয়েছে ওর?

কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই প্রথমে একটা হাত সরিয়ে নিল ছেলেটা, তারপর আরেকটা। কান্না থামিয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'দিপু, আমি। চিনতে পারছ?'

দাঁড়িয়েই রইল ছেলেটা। জবাব দিল না। মনে হলো চিনতে পারেনি।

'কি ব্যাপার, দিপু? আমি। তোমাকে ভালুকটা দিয়েছিলাম। চিনতে পারছ না?'

তাও কোন জবাব দিল না ছেলেটা। তাকিয়ে রইল। না চেনার ভঙ্গি।

ঘরে ঢুকল মিসেস ইসলাম। দিপুকে দরজায় দেখে জ্বলে উঠল তেলেবেগুনে। গটমট করে গিয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি মেরে বলল, 'এই পাজি ছেলে, এখানে কি? কতবার না বলেছি ঘর থেকে বেরোবি না!'

এক ধাক্কায় দিপুকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে দরজা টেনে দিল মিসেস ইসলাম। গজগজ করতে করতে এসে দাঁড়াল কিশোরের সামনে। দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও।'

একটা টিকেট ছিঁড়ে বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'ছেলেটা কি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে নাকি?'

'তাতে তোমার কি?' প্রায় থাবা দিয়ে ওর হাত থেকে টিকেটটা কেড়ে নিয়ে মুখের ওপর দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল মহিলা।

বারান্দা থেকে নেমে এসে রবিন বলল, 'ঘটনাটা কি? এই আচরণ কেন মহিলার?'

'সেটাই তো রহস্যময়। ছেলেটার সঙ্গে মায়ের মত আচরণ করেনি, তাই না?'

'সৎমায়ের চেয়ে খারাপ।'

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। রবিনের মুখের দিকে তাকাল। তাই তো! এ কথাটা মনে পড়েনি কেন? দিপু বলেছে, ওর মা নয়। ঠিকই বলেছে। অসুস্থ ছেলের সঙ্গে এ রকম জঘন্য আচরণ করতে পারবে না কোন মা।

পাওয়া গেছে জবাব। মিসেস ইসলাম দিপুর সৎমা।

কিন্তু তাও কেন যেন মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকল কিশোরের। মেনে নিতে পারল না জবাবটা। কোথায় যেন কি একটা ঘাপলা রয়ে গেছে।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

আট

পরদিন সকালে হাসপাতালে ঢুকে অফিসে রিপোর্ট করতেই ক্লার্ক বলল, ওকে দেখা করতে বলেছেন নার্স সুপারভাইজার।

আঁচ করে ফেলল কিশোর, গণ্ডগোল হয়েছে। নিশ্চয় চিনে ফেলেছিল গতকাল। তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে সাফিয়া। নইলে নার্স সুপারভাইজার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন কেন?

অফিসেই আছেন নার্স সুপারভাইজার মিসেস রাহেলা মমতাজ। ফাইল দেখছেন। কিশোরকে দেখে হেসে একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন, 'বসো।'

ফাইলটা দেখা শেষ করে একপাশে ঠেলে রেখে মুখ তুললেন আবার, 'তোমাকে চিলড্রেন্স ফ্লোর থেকে বদলি করে দিলাম। আজ থেকে এক্স-রে ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে। ওখানে কাজ করতে হয়তো ভাল লাগবে না তোমার, একঘেয়ে লাগতে পারে, তবু কিছু করার নেই। তোমার বিরুদ্ধে সিরিয়াস কমপ্লেন আছে।'

কে অভিযোগ করেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। নার্স সাফিয়া। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলতে গেল। কিন্তু হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে মিসেস মমতাজ বললেন, 'তোমার

কাজের ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই। গত কয়েকদিনের রেকর্ড খুব ভাল। কিন্তু রোগীদের ওপর গোপনে নজর রাখা, নিষিদ্ধ ফ্লোরে ঘোরাঘুরি করা হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী খুব বড় ধরনের অপরাধ। শুধু তাই না, চুরি করে নাকি রেকর্ড রুমে ঢুকে রোগীর ফাইলপত্রও ঘেঁটেছ তুমি।'

'প্লীজ, আমাকে বুঝিয়ে বলতে দিন,' অনুনয় করল কিশোর। 'নার্স সাফিয়া বলেছে তো? কেন ঢুকেছিলাম...'

'কিশোর, তুমি এখানকার চাকুরে নও। তাহলে লিখিত কৈফিয়ত চাইতাম আমি। তুমি স্বেচ্ছাসেবী, বিনে পয়সায় আমাদের সাহায্য করছ, তাতে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাকে আসলে শাস্তি দেয়ার অধিকার আমাদের নেই। পছন্দ না হলে বড় জোর বলে দিতে পারি, তুমি ভাই আর এসো না এখানে। লাগবে না তোমার ভলান্টিয়ারি। কিন্তু বেগম মেহেরুন্নিসার অনুরোধে তোমাকে ঢোকানো হয়েছে। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস না করে...'

'দেখুন, নার্স সাফিয়া আপনাকে কি বলেছে জানি না...'

আরেকটা ফাইল টেনে নিলেন মিসেস ইসলাম। 'সাফিয়া সিনিয়ার নার্স, অভিজ্ঞ। এই হাসপাতালের তাকে প্রয়োজন। সে আমাকে অনুরোধ করেছে তোমাকে চিলড্রেন্স ফ্লোর থেকে সরিয়ে দিতে। তার অনুরোধ না শুনে পারব না আমি।'

'দেখুন, আমার সম্পর্কে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে। কোন রোগীর ওপর গোপনে নজর আমি রাখিনি। সেটা যে অন্যায়, অভদ্রতা, এই সাধারণ জ্ঞানটুকু আমার আছে। একটা বাচ্চা ছেলে...'

'অহেতু আমার সময় নষ্ট করছ। এক্স-রে রুমে কাজ পছন্দ না হলে যখন খুশি বেরিয়ে যেতে পারো। দুর্গতদের সেবা করার আরও কত উপায় আছে। ত্রাণ বিতরণ, টিকেট বিক্রি...'

রাগ হয়ে গেল কিশোরের। এই অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে সে ছাড়বে না। নার্স সাফিয়া কেন তার পেছনে লেগেছে, সেটা না জেনে আর স্বস্তি নেই। জানতে হলে এই হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া চলবে না। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে, আমি এক্স-রে ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট করছি।'

এক্স-রে ডিপার্টমেন্টেও তাকে দিয়ে পিয়নের কাজই করানো হলো। ভাল কিছু নয়। খামে প্লেট ঢোকানো, ডাক্তারদের নির্দেশে কাউকে সেটা দিয়ে আসা, এ সব। খিঁচড়ে গেল মেজাজ। এই যদি হয় ভলান্টিয়ারি, জানত, তাহলে কোন গাধায় আসে এখানে কাজ করতে! সুযোগ পেয়ে চাকরের মত খাটানো হচ্ছে ওকে। কিছু বলতেও পারছে না। নিজের ইচ্ছেয় এসেছে। প্রতিবাদ করতে গেলে বলবে, ভাল না লাগলে বিদেয় হও। রাহেলা মমতাজ তো একবার বলেই দিয়েছেন। মানবিকতা দেখিয়ে মানুষের সেবা করতে এলে যে এত লাঞ্ছনা পোহাতে হয়, জানা ছিল না ওর।

গড়িয়ে গড়িয়ে কাটছে সময়। এমন এক জায়গায় ঢোকানো হয়েছে ওকে, এখান থেকে যে রহস্যের তদন্ত করবে তারও উপায় নেই।

কোনমতে কয়েকটা ঘণ্টা পার করে দিয়ে লাঞ্চের সময় ক্যান্টিনে ঢুকল। প্ল্যান একটা করে ফেলেছে। টেবিলে বসে রবিনের অপেক্ষা করতে লাগল।

রবিন এল। কি ঘটেছে জানাল কিশোর। তার পরিকল্পনার কথা বলল।

'তাই বলে ওর কাছে মাপ চাইতে যাবে?' ক্যান্টিনের কোলাহল ছাপিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন।

'আর কোন উপায় নেই। এই রহস্য ভেদ করতে হলে, অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইলে কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। সাফিয়াকে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে বলব, "আমার ভুল হয়ে গেছে সিসটার, মস্ত অন্যায় করে ফেলেছি আপনার কথা না শুনে। দিপুর ব্যাপারে নাক গলানোটা আমার অপরাধ হয়ে গেছে। এবারটির মত মাপ করে দিন।" বলব, "এক্স-রে রুমে কাজ করলে মারা পড়ব আমি। বেগম মেহেরুন্নিসার ভয়ে ছেড়েও যেতে পারছি না, তাহলে তিনি আর আস্ত রাখবেন না। একমাত্র ভরসা এখন আপনি। আমাকে বাঁচান, সিসটার। নার্স সুপারভাইজারকে বলে আপনার অভিযোগ তুলে নিন। কোন পেশেন্ট ফ্লোরে আমাকে কাজ করতে দেবার সুপারিশ করুন।" এ ভাবে বললে আমার বিশ্বাস না শুনে পারবে না।'

'কি জানি বাপু, কিছু বুঝতে পারছি না। খালার ভয়ে ভলান্টিয়ারি ছাড়তে পারছ না, এ রকম হাস্যকর যুক্তি ও মানলে হয়। আমি হলে হয় এক্স-রে রুমেই পচে মরতাম, নয়তো হাসপাতাল ছেড়ে দিতাম। তবু ওই ডাইনির সামনে আর যেতাম না।'

'আমিও যেতে চাই না। কিন্তু রহস্য ভেদ করতে হলে এ ছাড়া আর কোন পথও নেই। বুঝতে পারছ না?'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

'যদি জিজ্ঞেস করে রেকর্ড রূমে কেন ঢুকেছিলে? কি জবাব দেবে?'

'জবাব নেই। তাই মিথ্যে কথা বলতে হবে। বলব ও ঘরে কি আছে দেখার কৌতূহল হয়েছিল। বলব, আর এ রকম হবে না। আরেকবার চিলড্রেন্স ফ্লোরে কাজ করতে দেয়ার জন্যে হাতেপায়ে ধরব। সাফিয়া বললে মানা করবেন না মিসেস মমতাজ।'

'যদি সে বলে।'

'বলবে। হাজার হোক, সাধারণ নার্স ছাড়া তো আর কিছু নয় সে। চাকরির ভয় আছে। জানে আমি বেগম মেহেরুন্নিসার লোক। বেশি তেড়িবেড়ি করলে ভাল হবে না। আমি যে তাকে অনুরোধ করতে যাব এটাই তো বেশি। নরম না হয়ে পারবে না।'

'তা অবশ্য ঠিক। কবে কথা বলতে চাও?'

'আজই। ছুটির পর।'

'তারমানে তোমার বেরোতে দেরি হবে।'

'হতে পারে।'

'ঠিক আছে। আমি নিচে অপেক্ষা করব। একসঙ্গেই বাড়ি যাব।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

নয়

বিকেলে ডিউটি শেষে চিলড্রেন্স ফ্লোরে উঠল কিশোর। দল বেঁধে সেকেণ্ড উইং থেকে বেরিয়ে আসছে তখন শ্রমিকেরা। হই-চই করতে করতে এগোচ্ছে সিঁড়ির দিকে। সেদিনের মত কাজ শেষ ওদের। হাসপাতালের ডাক্তার আর নার্সদের শিফট বদলের সময়।

ডেস্কে বসে আছে নার্স বিশাখা গোমেজ। কানে রিসিভার। কথা বলছে টেলিফোনে, নজর বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাওয়া শ্রমিকদের দিকে। চোখে রাজ্যের বিরক্তি।

তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর।

কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে আনমনে বিড়বিড় করল বিশাখা, 'এই ওয়ার্কারগুলোকে দিয়েছে হাসপাতালের ভেতর দিয়ে যাওয়ার জায়গা! আর কাজ পেল না! একেবারে বাজার বানিয়ে ফেলল!' কিশোরের দিকে তাকাল। 'তোমার কি?'

'সাফিয়া সিসটারকে খুঁজছি। উনি কোথায়?'

'আছে এখানেই কোথাও,' উঠে দাঁড়াল বিশাখা। কোণের একটা টেবিল থেকে একটা মেডিকেল ট্রে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওয়ার্ডে যাবে।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। সাফিয়াকে খুঁজতে যাবে, না ওখানে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ভাবছে।

শেষে করিডরে বেরিয়ে এল। নার্স স্টেশনের উল্টোদিকে করিডরের মাথার কাছে দেখা গেল সাফিয়াকে। আশপাশে কোনদিকে না তাকিয়ে হেঁটে চলেছে সোজা।

ধরার জন্যে ছুটল কিশোর। ডাক দেবে, ঠিক এই সময় এমন একটা কাজ করল সাফিয়া, ডাক দেয়া আর হলো না ওর। সেকেণ্ড উইঙে যাওয়ার প্রবেশ নিষেধ লেখা দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল নার্স। কোন রকম দ্বিধা না করে ঢুকে গেল ভেতরে। লাগিয়ে দিল দরজা।

হাঁ হয়ে গেছে কিশোর। এই অসময়ে ওখানে কি কাজ সাফিয়ার?

যাবে নাকি দেখতে? নাহ্, উচিত হবে না। ওকে উঁকি মারতে দেখলে সাফিয়া যাবে আরও খেপে। এমনিতেই ওর বিরুদ্ধে চুরি করে নজর রাখার অভিযোগ করে এসেছে। এখন আবার সেই একই কাজ করতে দেখলে হাজার অনুনয় করেও আর তাকে নরম করতে পারবে না। তার চেয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। বেরিয়ে আসুক। তখন কথা বলবে।

নার্স স্টেশনে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল সে। এই সময় করিডর ধরে হেঁটে যেতে দেখল অরুণকে। সাফিয়া যেদিকে গেছে সেদিকে। কৌতূহল হলো কিশোরের। আবার বেরোল করিডরে।

অরুণও একই কাণ্ড করল। গিয়ে দাঁড়াল সেকেণ্ড উইঙে ঢোকার দরজাটার সামনে। আস্তে ঠেলে খুলে উঁকি দিল ভেতরে।

ভাবেভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে, বেশ সতর্ক। সেও ঢুকল ভেতরে, তবে সাফিয়ার মত অত নির্দ্বিধায় নয়।

অবাক কাণ্ড! পর পর ওরা দুজন গিয়ে ওই নিষিদ্ধ জায়গায় ঢুকল কেন? কথা বলবে? এই ভর সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার অসমাপ্ত ফ্লোরে ছাড়া কথা বলার আর জায়গা পেল না?

নাকি সাফিয়াকে গোপনে অনুসরণ করে ঢুকল অরুণ?

দরজার দিক থেকে মুহূর্তের জন্যে নজর সরাল না কিশোর। ওর অলক্ষ্যে যাতে সাফিয়া কিংবা অরুণ বেরিয়ে চলে যেতে না পারে। সাফিয়ার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে এখন ওরা ভেতরে কি করছে, জানতে বেশি আগ্রহী সে।

দশ মিনিট গেল। পনেরো মিনিট। বিশ। পঁচিশ। দুজনের কেউই বেরোল না সেকেণ্ড উইং থেকে।

অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। এতক্ষণ কি করছে ওরা?

নার্সদের শিফটিঙের অদল-বদল শেষ হয়েছে। যাদের ডিউটি শেষ, তারা চলে গেছে। নতুন ডিউটিওয়ালারা দায়িত্ব নিয়েছে।

অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখবে নাকি? পরক্ষণে বাতিল করে দিল ভাবনাটা—না, থাক। গোপনে লোকের ওপর নজর রাখার অভিযোগ করবে হয়তো গিয়ে আবার সাফিয়া। আর তাকে সুযোগ দেবে না ও।

কিন্তু জনশূন্য ওই নিষিদ্ধ উইঙে এতক্ষণ করছে কি ওরা?

বেশিক্ষণ আর কৌতূহল দমন করতে পারল না কিশোর। পায়ে

পায়ে এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে। কেউ কি তার ওপর নজর রাখছে? মনে হয় না। আর রাখলে রাখুকগে।

সাবধানে হাত বাড়িয়ে টান দিয়ে খুলল দরজাটা। উঁকি দিল ওপাশের অন্ধকারে।

লাশকাটা ঘরটার মতই যেন সব মৃত ওখানে। কোন শব্দ নেই। কোন নড়াচড়া নেই। বাতাসও যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। আলো এত কম, কোন জিনিসই পরিষ্কার দেখা যায় না। ঘরটা যে অনেক বড়, সেটা বোঝা যায়।

মেঝেতে পড়ে আছে কিম্ভূত সব জিনিস। বিল্ডিং বানাতে কাজে লাগে এ সব যন্ত্রপাতি আছে কয়েকটা। একপাশে সুড়কির স্তূপ। কোনখানেই কোন নড়াচড়া নেই।

'এই যে, শুনছেন?' ভয়ে ভয়ে ডাক দিল কিশোর।

কেউ জবাব দিল না।

গেল কোথায় অরুণ আর সাফিয়া? বেরোনোর মত আর কোন দরজাও চোখে পড়ল না। ফ্লোরগুলো থেকে নামার সিঁড়ির কাঠামোও তৈরি হয়নি এখনও যে ওটা বেয়ে নেমে যাবে। ওঠানামার আর কোন জায়গা নেই বলেই তো শ্রমিকরাও হাসপাতালের ফার্স্ট উইঙের সিঁড়ি ব্যবহার করে।

'কেউ আছেন?' আবার ডাকল সে। নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল স্বরটা। কেমন খসখসে।

পড়ে থাকা ওই যন্ত্রগুলোর আড়ালে কি ঘাপটি মেরে আছে কেউ? কোন কারণে লুকিয়ে পড়েছে দুজনে? তাই বা কেন করবে? কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

কি ঘটেছে না দেখে যেতে ইচ্ছে করল না। দরজার অন্যপাশে চলে এল ও। খোলা দেখলে কেউ সন্দেহ করতে পারে এ জন্যে পেছনে ভেজিয়ে দিল পাল্লাটা। সাবধানে পা বাড়াল সামনে। সুড়কি, বালি, যন্ত্রপাতির ফাঁকফোকর দিয়ে এগোল অন্য প্রান্তের দেয়ালের দিকে। চিৎকার করে ডাকল আবার, 'সিস্টার সাফিয়া? অরুণ?'

তার চিৎকার দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে আবার ফিরে এল তার কানে। যাদের ডাকা হলো তাদের কেউই জবাব দিল না।

নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেল ওর।

ধীরে ধীরে পৌঁছে গেল অন্য পাশের দেয়ালের কাছে।

দেখল না ওদের কাউকে।

আশ্চর্য! গেল কোথায় দুজন মানুষ? হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না।

অন্ধকারে কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে অবশ্য। মেঝেতে কালো জিনিসটা যে পড়ে আছে ওটা কি?

এগিয়ে গিয়ে দেখল সে।

দড়ি আর তারের বাণ্ডিল। দড়িতে হাত দিয়েই চমকে গেল। মনে হলো সাপ নড়াচড়া করে উঠেছে।

নাহ, নেই দুজনের কেউ। কোন দিক দিয়ে বেরিয়েছে ওরাই জানে! এখানে বেশিক্ষণ থাকলে সিকিউরিটি গার্ডের চোখে পড়ে যেতে পারে। তাহলে মুশকিল হবে। বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

ফিরে চলল আবার। কোন পথে এসেছিল, অন্ধকারে ঠিক রাখতে পারল না। দরজাটা খোলা রাখলে হত। ফাঁক দিয়ে আলো

দেখা যেত। ফিরে যেতে পারত সহজে।

অন্ধকারে দ্রুত পা চালাতে গিয়ে আরেকটু হলে মরতে বসেছিল। সামনে ফেলতে গিয়ে পায়ের নিচে মেঝে পেল না। খালি। শেষ মুহূর্তে ঝট করে সরিয়ে আনল পা'টা। আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে দেখল, সামনের দেয়ালে কালো ফোকর। মেঝেতেও ফোকর। এলিভেটর তৈরির জন্যে জায়গা রাখা হয়েছে। দেয়ালের ফোকরটাতে দরজা হবে, মেঝের ফোকরে শ্যাফট। চার তলা থেকে নিচে পড়লে কি হত ভেবে শিউরে উঠল সে।

কাঁপুনি শুরু হলো তার শরীরে। চিকণ ঘাম দেখা দিল। হাঁটতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করল না আর। অসমাপ্ত এই বিল্ডিঙে কোথায় কোন মৃত্যুফাঁদ লুকিয়ে আছে কে জানে! সাবধানে যতটা সম্ভব দেখে দেখে পা ফেলতে লাগল।

নরম কিসে যেন পা লাগল। মনে হলো নড়ে উঠল জিনিসটা। ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে সরে গেল সে।

কিসে পা লেগেছে দেখার জন্যে হাঁটু মুড়ে বসে ঝুঁকে তাকাল। ছড়িয়ে থাকা একটা হাত।

ধক করে উঠল বুক। নজর সরাল আস্তে আস্তে।

বালির স্তূপের ধার ঘেঁষে পড়ে আছে একটা দেহ। অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে যতখানি দেখা গেল তাতেও চিনতে অসুবিধে হলো না।

চিত হয়ে পড়ে আছে নার্স সাফিয়া। চোখ দুটো খোলা। গলায় বিঁধে আছে লম্বা একটা সার্জিক্যাল নাইফ।

হাঁ করে লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

ওটা যে লাশই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে ভাবে ছুরিটা গলায় বিঁধে আছে, এরপর কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

তারপরেও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সাহস করে গলায় হাত দিল সে। কয়েক ফোঁটা রক্ত লাগল হাতে। এমনভাবে ঢোকানো হয়েছে ছুরিটা, ক্ষতের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরোতে পারেনি। মনে হয় এমন কেউ করেছে খুনটা, যার জানা আছে কোথায় ছুরি ঢোকালে রক্তে ভেসে যাবে না। দ্রুত মারা যাবে। দেখে মনে হয় পেশাদার খুনীর কাজ!

কিন্তু সাফিয়ার পেছনে ঢুকতে তো দেখল অরুণকে। তার যা বয়েস, পেশাদার খুনী হওয়ার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। এমন হতে পারে, ঘ্যাঁচ করে গলায় মেরে দিয়েছে। ঠিক জায়গায় লেগে গেছে। মারাটাই উদ্দেশ্য ছিল তার। দ্রুত মরবে, রক্ত কম বেরোবে, এ সব নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায়নি। কাকতালীয়ভাবেই যা ঘটার ঘটে গেছে।

আরও কয়েকটা সেকেণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বসে রইল কিশোর। তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ছুটে চলল দরজাটার দিকে।

দৌড়ে এসে নার্স স্টেশনে ঢুকল। দেখে ডেস্কে বসে আছে নার্স বিশাখা। রবিন কথা বলছে। নিশ্চয় ওর কথাই জিজ্ঞেস করছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর।

ফিরে তাকাল রবিন, 'নিচে দাঁড়িয়ে আছি সেই কখন থেকে। কোথায় গিয়েছিলে?'

হাত নেড়ে ডাকল কিশোর, 'এদিকে এসো। কথা আছে।' বিশাখার কাছ থেকে সরিয়ে এনে দরজার দিকে হাত তুলে বলল,

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

'নার্স সাফিয়া মরে পড়ে আছে ওর ভেতরে। গলায় ছুরি বেঁধা।'

'বলো কি? কে মারল?'

'জানি না!'

'তুমি গিয়েছিলে কেন ওখানে?'

'সে অনেক কথা। পরে বলব। ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার। তারপর পুলিশ...'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

দুজনেই বিশাখার ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের উত্তেজিত মুখ দেখে জিজ্ঞেস করল নার্স, 'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?'

সাফিয়াকে কোথায়, কি অবস্থায় দেখে এসেছে জানাল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে নার্স। বিশ্বাস করতে পারছে না। আচমকা নড়ে উঠল সে। থাবা মেরে তুলে নিল রিসিভার। দ্রুত কয়েকটা নম্বর টিপল। রিসিভারে প্রায় চিৎকার করে বলল, 'ডাক্তার হারুণ আছেন?...দাও! জলদি!...কে? স্যার বলছেন? নয় তলায়। বিশাখা। স্যার, এখুনি একবার আসতে হবে আপনাকে। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে!'

লাইন কেটে দিয়ে আরেকটা নম্বরে রিঙ করল সে। 'সিকিউরিটি? জলদি! চার তলায়। খুন!'

চেয়ার ঠেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বিশাখা। 'রেসিডেন্ট ডক্টরকে খবর দিয়েছি। আসছেন। সিকিউরিটিও আসছে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'চলো।' ডেস্কের অন্যপাশ থেকে

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

বেরিয়ে এল সে। দুই গোয়েন্দাকে তার সঙ্গে আসার ইশারা করে হাঁটতে শুরু করল।

আগে আগে চলল কিশোর। তাড়াহুড়ো করে করিডরে বেরোতে গিয়ে ধাক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল আরেকটু হলে একটা বেডের সঙ্গে। সার্জিক্যাল মাস্ক পরা একজন অর্ডারলি বেডটা ঠেলে নিয়ে চলেছে এলিভেটরের দিকে। তাতে রোগী। চাদর দিয়ে ঢাকা। অপারেশনের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে বোধহয়।

বেডের পাশ কাটিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে সেকেণ্ড উইঙে ঢোকার দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল।

এই সময় এলিভেটর থেকে নেমে এলেন ডাক্তার হারুণ। সঙ্গে ছাই রঙের ইউনিফর্ম পরা দুজন সিকিউরিটি গার্ড।

সবাই ঢুকল অন্ধকার ঘরটাতে।

বড় টর্চ জ্বালল একজন সিকিউরিটি। দুজনের মধ্যে সে লম্বা। নানা রকম জিনিস আর আবর্জনায় বোঝাই ঘরটার মধ্যে আলোটা ঘুরিয়ে আনল একবার।

কেউ নেই।

কিশোর যা যা বলেছে ডাক্তারকে বলছে বিশাখা।

'লাশটা কোথায় পড়ে থাকতে দেখেছ?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল গার্ড।

এলিভেটরের গর্তের কাছে বালির স্তূপটা দেখাল কিশোর।

আরেক সিকিউরিটির টর্চটা চেয়ে নিয়ে দৌড় দিলেন ডাক্তার হারুণ। স্তূপটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পেছন পেছন গেল দুই গার্ড

আর বিশাখা। টর্চের আলো ফেলে দেখছে।

কিশোর আর রবিন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

অবাক লাগছে কিশোরের। কেউ কিছু করছে না কেন? ডাক্তার সাহেব লাশটা পরীক্ষা করে দেখছেন না কেন! কোন প্রতিক্রিয়া নেই কারও মধ্যে।

এগিয়ে গেল কিশোর।

বালির স্তূপের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

দশ

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল যেন কিশোর। কয়েক পা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল তার কাছে। ফিসফিস করে বিমূঢ় কণ্ঠে বলল, 'লাশটা নেই!'

'তা কি করে হয়? এইমাত্র না দেখে গেলে তুমি?'

'শুধু দেখিনি, হাত দিয়ে দেখেছি। আঙুলে রক্তও লেগেছিল।'

'পড়লে আরও ঝামেলায়। তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'বুঝতে পারছি।'

সিকিউরিটির লম্বা লোকটা গিয়ে উঁকি দিচ্ছে এলিভেটর শ্যাফটের ভেতরে। আলো ফেলে দেখল। ফিরে তাকিয়ে তার সঙ্গীকে বলল, 'কিছুই নেই।'

দ্বিতীয় লোকটাও গিয়ে শ্যাফটের গর্তে আলো ফেলল। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ডাক্তার হারুণ আর বিশাখা।

ফিসফিস করে রবিন বলল, 'আস্ত একটা মানুষ বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। লাশ হোক আর যাই হোক।'

'সেকথাই তো ভাবছি। দশ মিনিট আগেও ছিল ওখানে

সাফিয়ার লাশ। আমি বেরোনোর পর সরিয়েছে। এত তাড়াতাড়ি সরাল কি করে!'

'কাকে সন্দেহ হয় তোমার?'

'সাফিয়ার পেছন পেছন অরুণকে এখানে ঢুকতে দেখেছিলাম।'

'অরুণ!' নাক দিয়ে খোঁত খোঁত শব্দ করল রবিন। 'ও খুন করেছে?'

'সার্জিক্যাল নাইফ চুরি করতে দেখেছি আমি ওকে। ওরকম একটা ছুরিই গলায় বেঁধা ছিল সাফিয়ার,' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে দুবার চিমটি কাটল কিশোর।

ঘুরে দাঁড়াল দুই সিকিউরিটি, ডাক্তার আর বিশাখা।

রবিন বলল, 'আসছে। ধমক খাওয়ার জন্যে তৈরি হও।'

কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল বিশাখা। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'কই, লাশ কোথায়? কি দেখেছ তুমি?'

'লাশই দেখেছি আমি!' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'কোন সন্দেহ নেই আমার!'

'তাহলে গেল কোথায় ওটা?'

'বুঝতে পারছি না!'

বিশাখার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। আলো ফেললেন কিশোরের মুখে। বুঝতে পারলেন মিথ্যে বলছে না কিশোর। সবাইকে অবাক করে দিয়ে হেসে ফেললেন, 'বুঝেছি কি হয়েছে। ওই গাধা, হান্নানটা করেছে এই কাজ। সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে রসিকতা করে। ওর এই ইস্কুলের স্বভাব আর গেল না। নিশ্চয় মর্গ থেকে এনে বেওয়ারিশ কোন মহিলার লাশ নার্সের পোশাক পরিয়ে

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

ফেলে রেখেছিল এখানে। জানে, নাইটগার্ড টহল দিতে এলে দেখতে পাবে। যেহেতু ডিউটিতে রয়েছি আমি, ডাক পড়বে আমার। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসব। বোকা বনব। কারণ, আমরা আসার আগেই লাশ সরিয়ে ফেলবে সে। তার প্ল্যান মতই সব হয়েছে। কেবল নাইট গার্ডের জায়গায় তুমি ঢুকেছিলে এখানে।'

কিশোর কেন ঢুকেছে, এ প্রশ্নটা মাথায় এল না হারুণের। জবাব দেয়া থেকে বেঁচে গেল কিশোর।

অবাক কণ্ঠে বিশাখা বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন, স্যার, আজও আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছেন ডাক্তার হান্নান?'

'তা ছাড়া আর কে?'

'কিন্তু লাশটা সরাল কিভাবে?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'এত তাড়াতাড়ি?'

কনুইয়ের গুঁতো মারল রবিন। মনের ভাব, ঝামেলাটা যখন কেটে যাচ্ছে, যাক না। আবার সেটাকে খুঁচিয়ে ঝামেলা বাড়ানো কেন!

'আরে হান্নানকে তোমরা চেনো না। ওর অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

অসাধ্যটা কিভাবে সাধন করেছে, সেটা জানার প্রবল ইচ্ছেটা আপাতত চাপা দিল কিশোর। রবিনের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে চুপ হয়ে গেল। ঝামেলাটা আপাতত কেটেই যাক।

সেকেণ্ড উইং থেকে বেরিয়ে এল সবাই।

বিশাখা চলে গেল তার ডেস্কের দিকে।

দুই গার্ড এবং ডাক্তার হারুণের সঙ্গে এলিভেটরে করে নিচে

নেমে এল কিশোর আর রবিন। গার্ডরা চলে গেল ওদের অফিসের দিকে।

নিজের অফিসে যাওয়ার আগে দুই গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন হারুণ। 'ছেলেরা, শোনো, একটা অনুরোধ করব তোমাদের। এ কথাটা ডাক্তার হান্নানকে বোলো না। আমি ওর সামনে এমন ভান করব যেন কিছু জানিই না। তার রসিকতার ফাঁদে পা দিইনি বুঝলে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে সে। ওটাই হবে তার ওপর আমার প্রতিশোধ।'

বড় বড় মানুষেরাও কেমন ছেলেমানুষের মত কাণ্ড করে, দেখে অবাক হয়ে গেল রবিন। চুপ করে রইল।

কিন্তু কিশোর এত সহজে মেনে নিতে পারল না। 'আপনার কি ধারণা এসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে? এধরনের রসিকতা করার বয়েস কি আছে ডাক্তার হান্নানের?'

আবার ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে ভেবে প্রমাদ গুনল রবিন। তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আমরা কাউকে কিচ্ছু বলব না। কিশোরই ভুল করেছে। অন্ধকারে অন্য লাশকে সাফিয়া ভেবেছে। এছাড়া আর কি হবে? এসো, কিশোর, যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

হাত ধরে টেনে ওকে সরিয়ে আনল রবিন।

ডাক্তার হারুণ চলে গেলেন।

হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর। রবিনকে বলল, 'তুমি বাড়ি যাও। আয়না খালা যদি ফেরেন, আমার কথা জিজ্ঞেস করেন, বলবে হাসপাতালে কাজ আছে। আমার ফিরতে দেরি হবে।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'এ রহস্যের শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না।'

'করবেটা কি তুমি?'

'ওপরে যাচ্ছি। চিলড্রেন্স ফ্লোরে। তুমি বাড়ি চলে যাও।'

রবিনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এলিভেটরের দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

আবার ওকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল নার্স বিশাখা। 'তুমি?'

'নার্স সাফিয়ার সঙ্গে দেখা না করে যাব না।'

'ওকে না খানিক আগে মৃত দেখে এসেছ বললে?'

'এখন তো জানি ভুল দেখেছি। ডাক্তার হান্নান রসিকতা করেছেন ডাক্তার হারুণের সঙ্গে।'

'তুমি ওসব কথা বিশ্বাস করেছ?'

'করব না কেন? আপনাদের কথা শুনে তো বুঝলাম, এরকম রসিকতার ঘটনা আরও ঘটেছে এই হাসপাতালে।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল বিশাখা। আর কিছু না বলে ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করে পাতা ওল্টাতে শুরু করল।

'আমি এখানে বসি?' অনুমতি চাইল কিশোর।

'বসো,' মুখ না তুলেই বলল বিশাখা।

কয়েক মিনিট পর জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আচ্ছা, সিসটার, সাফিয়া খাতুন কোথায় গেছে কিছু অনুমান করতে পারেন? আসছে না কেন এখনও?'

'ডিউটি শেষ। ফিরে আসার তো কোন কারণ দেখি না আমি। শুধু শুধু বসে আছ। কাল সকালে কথা বোলো।'

'দেখি, থাকি না আরেকটু। আসতেও তো পারে।'

'তোমার ইচ্ছে,' আবার ম্যাগাজিনে মন দিল বিশাখা।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

এখানে বসে এখন নার্স সাফিয়ার অপেক্ষা করছে না কিশোর। বিশাখাকে মিথ্যে কথা বলেছে সে। ওর উদ্দেশ্য, আবার ঢুকবে ছোট অফিসটায়। রেকর্ড রুমে। কখন সুযোগ পাবে, কতক্ষণ দেরি হবে, কিছুই জানে না। তাই দাঁড় করিয়ে না রেখে বিদেয় করে দিয়ে এসেছে রবিনকে।

বসে বসে ভাবতে লাগল সে। সাফিয়া খুন হয়েছে কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু ওর লাশটা সরানো হলো কিভাবে? প্রশ্নটার জবাব জানা গেলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যেত। খুনীকে, হয়তো সেটাও অনুমান করা যেত।

অরুণ খুন করেছে, কিছুতে মেনে নিতে পারছে না এ কথা। কিন্তু নিজের চোখে যে দুটো ঘটনা ঘটতে দেখল—ছুরি চুরি, আর সাফিয়াকে অনুসরণ করে গিয়ে সেকেণ্ড উইঙে ঢোকা—এর কি ব্যাখ্যা?

সব রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ওই ছোট্ট ছেলেটার অদ্ভুত আচরণের মধ্যে। দিপু!

দিপু···নার্স সাফিয়া···অরুণ···কোথাও না কোথাও, কোন না কোনভাবে একটা যোগাযোগ আছেই তিনজনের মধ্যে। সেটা কি জানা গেলে সমাধান করে ফেলা যাবে রহস্যের।

আবার যেতে হবে হিরণ মিয়ার ভূতের গলিতে। দিপুদের বাড়িতে। তবে তার আগে ওর মেডিকেল ফাইলটা দেখতে হবে আরেকবার ভাল করে। গতকাল তাড়াহুড়োয় সবটা পড়তে পারেনি।

কখন আসবে রেকর্ড রুমে ঢোকার সুযোগ? নার্স বিশাখা ওঠে না কেন? বসে আছে তো আছেই। এ সময়টায় তেমন ডিউটি দিতে

হয় না রোগীদের কেবিনে। কাজ তাই কম।

অবশেষে ট্রলিতে করে খাবার নিয়ে উঠে আসতে লাগল বয় আর আয়ারা। রোগীদের রাতের খাবার সরবরাহের সময় হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল বিশাখা। ঠিকমত খাবার দেয়া হচ্ছে কিনা তদারক করতে হবে ওকে। চলে গেল একজন আয়ার পেছন পেছন।

কারও নজর আছে কিনা ওর দিকে দেখল কিশোর। নেই। আস্তে করে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ছোট অফিসটার দরজার দিকে। আরেকবার দেখল, কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

দরজা লাগিয়ে আলো জ্বেলে দিল সে। জানা আছে কোন তাকে রয়েছে দিপুর ফাইল। সোজা এগোল সেদিকে।

কিন্তু নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে থেমে গেল। ফাইলটা নেই আগের জায়গায়।

খুঁজতে শুরু করল সে। যে তাকে রেখেছিল, সেখানে পেল না। পরিষ্কার মনে আছে, গতকাল দেখার পর এখানেই রেখে গিয়েছিল। হয়তো এরপর কেউ সরিয়ে অন্য কোনখানে রেখেছে।

নিচের তাকে দেখল। তার নিচের তাকে। তন্ন তন্ন করে খুঁজল সবগুলো তাক।

কোথাও নেই। আশ্চর্য! গেল কোথায় ফাইলটা?

নতুন ফাইলের তাক, পুরানো ফাইলের তাক, সমস্ত জায়গায় ঘাঁটাঘাঁটি করল। কিন্তু নেই তো নেইই। পেল না ফাইলটা। দিপুর নামে কোন চার্টও চোখে পড়ল না। যেন দিপু নামের কোন ছেলে কোনকালে ভর্তিই হয়নি এই হাসপাতালে।

বড়ই তাজ্জব ব্যাপার!

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

এগারো

'নার্স সাফিয়ার দেখা পেলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

পরদিন দুপুরে ক্যান্টিনে খেতে বসেছে দুজনে। মুখ তুলল কিশোর। 'তোমার কি এখনও ধারণা কাল রাতে আমি ভুল দেখেছি?'

'না না, তা নয়,' কিশোরের দৃষ্টি এড়াতে রূপচাঁদার কাঁটা বাছায় মন দিল রবিন। 'এমনি জিজ্ঞেস করেছি। কোন খোঁজ আছে কিনা···খুব টেস্টি মাছ।'

'দু'তিন দিনের আগে খোঁজ পড়বে বলে মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে ভাত মুখে দিল কিশোর।

'কেন?'

'হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অনুপস্থিত থাকতে পারে যে কেউ। দু'তিন দিন যাওয়ার পরও যদি কোন খবর না পাঠায় অফিসে, তখন হয়তো খোঁজ নেয়ার ব্যবস্থা করবেন শিফট-ইন-চার্জ। নাও করতে পারেন। এত বড় হাসপাতাল। কত নার্স। একজন নার্সের অনুপস্থিতি খুব একটা নজরে আসবে না কারও।'

'বিশাখা আসবে। আর ডাক্তার হারুণের। টনক নড়বে।

হয়তো শিফট-ইন-চার্জকে জানাবে কালকের ঘটনাটার কথা।'

'হয়তো। তবে ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি।'

'কি করবে?'

'সাফিয়ার বাড়িতে যাব। বাড়ির লোককে ওর কথা জিজ্ঞেস করব। দেখি, ওরা কি বলে? তবে আমার বিশ্বাস, যাওয়া লাগবে না। আজই খোঁজ করতে আসবে ওরা। হাসপাতালে দু'তিনদিন অনুপস্থিত থাকলে এখানকার কেউ হয়তো খোঁজ নেবে না, কিন্তু বাড়িতে চব্বিশ ঘন্টা না গেলেই বাড়ির লোকে অস্থির হয়ে পড়বে।'

'তা ঠিক।'

খাওয়া শেষ করে রবিন চলে গেল তার ডিউটিতে। কিশোর উঠে এল এক্স-রে রুমে। গড়িয়ে গড়িয়ে কাটল আরেকটা একঘেয়ে দিন।

বিকেলের শিফট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিলড্রেন্স ফ্লোরে উঠে এল সে। সাফিয়ার ঠিকানা জানা দরকার। নার্স বিশাখা এসেছে। কিশোরকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কাল সাফিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'না।'

'আজকে?'

'আজ তো আসেইনি। সেজন্যেই এলাম আপনার কাছে। ওর ঠিকানা দরকার।'

'কি এমন কাজ তোমার ওর কাছে?'

যেন খুব অসহায় বোধ করছে, এমন ভঙ্গি করে বলল কিশোর, 'এক্স-রে রুমে কাজ করতে আমার ভাল লাগে না। সিস্টার সাফিয়া

নার্স সুপারভাইজারের কাছে কমপ্লেন করেছে। তাই তাকে ধরেই আবার এখানে ফেরার ইচ্ছে। সুপারভাইজারকে বলে যদি আবার আমাকে এখানে নিয়ে আসে, বেঁচে যাই।'

মৃদু হাসল বিশাখা। 'ও, এই সমস্যা। আমাকে আগে বললেই পারতে। ঠিক আছে, আমার সঙ্গে দেখা হলে সাফিয়াকে বলে দেব।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল কিশোরের মুখে। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সিসটার। কোথায় দেখা হবে? থাকে কোথায়?'

'কেন, হাসপাতালের নার্স কোয়ার্টারে।

'ও, আমি ভেবেছি বাড়িতে থাকে। পরিবারের সঙ্গে।'

'না, থাকে না। স্বামীটা একটা শয়তান। কাজকর্ম কিচ্ছু করে না। ভাত দিতে পারত না। উল্টে মাতাল হয়ে এসে ভাত চেয়ে না পেয়ে বৌকে পেটাত। একটা মেয়ে আছে। সহ্য করতে না পেরে শেষে মেয়েকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল একদিন সাফিয়া। পেটের দায়ে নার্সের চাকরি নিল।'

'মেয়েটা এখন কোথায়?'

'চিটাগাঙে। হোস্টেলে রেখে পড়ায় ওকে সাফিয়া। ডাক্তার বানাবে।'

নার্স সাফিয়ার বদমেজাজের একটা বড় কারণ খুঁজে পেল কিশোর। তার এতিম মেয়েটার কথা ভেবে দুঃখ হলো। কে দেখবে এখন ওকে? বাপের কাহিনী তো যা শুনল, ও থাকা না থাকা সমান কথা।

ঘড়ি দেখল বিশাখা। 'এখনও আসছে না কেন?' আনমনে বলল,

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

'হয়তো আজ আর আসবেই না। মাঝে মাঝে এ রকম চলে যায়।'

'কোথায়? মেয়ের কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল বিশাখা।

'স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক?'

'আছে, নামকা ওয়াস্তে। স্বামীটাই রেখেছে। টাকার জন্যে। নিয়মিত টাকা নিতে আসে সাফিয়ার কাছে। না দিলে ভয় দেখায় আদালতে নালিশ করে মেয়েকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেবে। কিছুদিন আগে এসে হুমকি দিয়ে গেছে, ওর টাকার বড় প্রয়োজন। বিশ হাজার টাকা দিতে হবে। খুবই মুষড়ে পড়েছে বেচারি সাফিয়া। এত টাকা একসঙ্গে ও কোত্থেকে দেবে?'

ব্ল্যাকমেলের গন্ধ পাচ্ছে কিশোর। আগ্রহী হয়ে উঠল। সাফিয়ার স্বামীর সঙ্গে কথা বললে হয়তো মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে। কানিবকের মত সামনে গলা বাড়িয়ে দিল সে, 'নাম কি লোকটার? কোথায় থাকে?'

'নাম বারেক। কোথায় থাকে জানি না। তবে কক্সবাজারে থাকে না, এটুক জানি।'

ঠোকর দেয়ার পর মাছ ফসকে যাওয়া বকের মতই আবার গলাটা ফিরিয়ে আনল কিশোর। 'ও!'

আগের দিন লাশ দেখার কথা নিয়ে কোন কথা তুলল না আর বিশাখা। কিশোরও সে সম্পর্কে কিছু বলল না। যা জানতে এসেছিল, তার চেয়ে বেশিই জেনেছে। সন্তুষ্ট হয়ে, বিশাখাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে নার্স স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল।

বাড়ি ফেরার পথে প্রাইমারি স্কুলে ঢুকে দেখল রবিন আছে

কিনা। আছে। ও বলল, ফিরতে তার আরও কিছুটা দেরি হবে। কাজের চাপ পড়ে গেছে। রাতেই কর্মীদের মধ্যে বিলি-বণ্টন শেষ করে রাখতে হবে। খুব ভোরে যাতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে ওরা।

বাড়ি এসে দেখল, খালা ফেরেননি।

কাজের বুয়া চা-নাস্তা দিয়ে গেল।

হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নিল সে। ভূতের গলিতে যাওয়ার কথা ভাবল। রবিন কখন ফেরে ঠিক নেই। ওর জন্যে বসে থাকলে দেরি হয়ে যাবে। হয়তো আজ আর যাওয়াই হবে না, ভেবে উঠে পড়ল। কাপড় বদলে নিল। জিনসের প্যান্ট পরল। খয়েরী রঙের গেঞ্জি। যাতে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকা সহজ হয়। বাড়িটার ওপর চুরি করে নজর রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা নিল। ভূতের গলির মুখের কাছে যখন পৌঁছল, শেষ বিকেলের লম্বা ছায়া পড়েছে।

গোরস্থানের কাছে এসে রিকশা ছেড়ে দিল।

রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রিকশাওয়ালা। বাঁক নিয়ে ওটা অদৃশ্য হয়ে যেতে কয়েক মিনিট লাগল। একেবারে নীরব হয়ে আছে এলাকাটা। রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় নেই। মনে হতে লাগল ভূতের গলির স্তব্ধ আবহাওয়া যেন গিলে নিল ওকে। মোটেও ভাল লাগল না পরিবেশটা।

পাহাড়ী অঞ্চলে বিকেল শেষ হতে না হতেই অন্ধকার নামল। গোধূলির সময় বড় কম। একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠতে লাগল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়িগুলোর জানালায়। গাছপালা আর

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

ঝোপঝাড়ের ফাঁকে এখানে সাধারণ আলোকেও অপার্থিব লাগছে।

দিপুদের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

গেটের কাছে এসে সামনে দিয়ে না ঢুকে ঘুরে পেছন দিকে চলে এল। ঘন ঝোপঝাড় জন্মে আছে। সেগুলোর ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে চলে এল রান্নাঘরের জানালার কাছে। আলো জ্বলছে। আস্তে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল ভেতরে।

একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে আছে দিপু। চেনাই যাচ্ছে না। চেহারাটা অন্য রকম লাগছে। অসুস্থতা কতটা বদলে দেয় মানুষের চেহারা—ভেবে অবাক লাগল ওর। দিপুর চোখ বোজা। তবে ঘুমাচ্ছে না। তার সামনে বসে থাকা একজন মহিলার কথায় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খুব আস্তে মাথা নাড়ছে মাঝেমধ্যে।

মহিলাকে আগে কখনও দেখেনি কিশোর। জানালার একটা পাল্লা ফাঁক হয়ে আছে। কিন্তু মহিলা এতই নিচু স্বরে কথা বলছে, বুঝতে পারল না সে। দিপুর পরনের পোশাক দেখে অনুমান করল, ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। একটা ছোট সুটকেস রাখা আছে দরজার কাছে। খেলনা ভালুকটা দেখতে পেল না।

মিসেস ইসলামের চেয়ে এই মহিলার বয়েস কম। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অধৈর্য। দিপুকে কোনমতে বোঝাতে না পেরেই বোধহয় রেগে যাচ্ছে সে।

কি বলছে ও? কোথায় নিয়ে যেতে চায় ছেলেটাকে?

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একটা লোক। সঙ্গে মিসেস ইসলাম। টেবিলের সামনে বসে থাকা মহিলাকে কিছু জিজ্ঞেস করল লোকটা। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মহিলা।

হাত ধরে দিপুকে চেয়ার থেকে টেনে নামাল ওর মা।

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল দিপু। পারল না। কেঁদে ফেলল। টানতে টানতে ওকে দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে গেল মিসেস ইসলাম।

সুটকেস তুলে নিয়ে ওদের পেছন পেছন গেল লোকটা। ওদের পেছনে দ্বিতীয় মহিলা।

ছেলেটাকে নিয়ে বাইরে বেরোল তিনজনে। বারান্দার নিচে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

অসহায় বোধ করল কিশোর। ওর গাড়ি নেই। ওদেরকে অনুসরণ করতে পারবে না। গাড়িটার নম্বর লিখে রাখা দরকার। কাগজ কলমের জন্যে পকেটে হাত দিল। নেই। মরিয়া হয়ে হাতড়াতে শুরু করল অন্য পকেটগুলো। কোনটাতেই নেই। বাসায় ফিরে কাপড় বদলেছে। তারপর নোটবুক এবং কলম নেয়ার কথা আর মনে ছিল না।

নিলেও লাভ হত না। কি লিখত? এতই অন্ধকার, গাড়ির নম্বর প্লেট পড়তে পারছে না। বাড়ির সামনে কোন আলো জ্বালা হয়নি।

ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে দেখল, দিপুকে নিয়ে গাড়ির পেছনের সীটে উঠল দ্বিতীয় মহিলা। লোকটা উঠল ড্রাইভিং সীটে। বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইল মিসেস ইসলাম। ছেলের কান্নায় তার বিন্দুমাত্র মন ভেজেনি।

হেডলাইট জ্বলল গাড়িটার। দড়াম করে দরজা লাগাল লোকটা। এঞ্জিন স্টার্ট নিল। চলতে আরম্ভ করল গেটের দিকে। পেছনের সীটে নেতিয়ে পড়েছে দিপু।

বেরিয়ে গেল গাড়ি। ভারি হয়ে উঠল নীরবতা। ঘরে ঢুকে সামনের দরজা বন্ধ করে দিল মিসেস ইসলাম।

যেখানে ছিল সেখানেই রইল কিশোর। শূন্য রান্নাঘরে ফিরে আসতে দেখল মহিলাকে।

আর কিছু দেখার নেই এখানে। সরে আসতে যাবে, ঠিক এই সময় কানে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার। বাড়ির ভেতরের কোন একটা ঘর থেকে। শব্দটা যেন ফুঁড়ে দিল রাতের নীরবতাকে।

পাগলের মত চিৎকার করছে একটা বাচ্চা ছেলে। তারপর ফোঁপাতে শুরু করল। মারছে মনে হলো ওকে কেউ।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

বারো

স্তব্ধ হয়ে গেছে কিশোর।

থেমে গেছে কান্নার শব্দ। আবার নীরব হয়ে গেল ভূতের গলি। বাড়ির ভেতর থেকে আর কোন শব্দ আসছে না।

দিপুকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওর চোখের সামনে। এতক্ষণে নিশ্চয় অনেক দূরে চলে গেছে গাড়িটা। চিৎকার করেছে অন্য একটা ছেলে। কে সে?

জটিল হয়ে উঠেছে আরও রহস্য। অনেক প্যাঁচ।

এই বাড়ির সঙ্গে হাসপাতালে নার্স খুনের সত্যি কি কোন সম্পর্ক আছে? ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে মনে আগাগোড়া খতিয়ে দেখতে লাগল সে। একই সঙ্গে রান্নাঘরের দিকেও চোখ রাখল।

ঘটনার সূত্রপাত ক্যান্সার হাসপাতালে। চার তলায়। চিলড্রেন্স ফ্লোরে। ছোট ছেলের কান্না শুনে দেখতে গিয়েছিল সে। ছেলেটার আচরণ অস্বাভাবিক লেগেছে। নার্স সাফিয়ার আচরণ অস্বাভাবিক ছিল। দিপুর মায়ের আচরণ অস্বাভাবিক। অরুণের আচরণ অস্বাভাবিক। এদেরকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে রহস্য।

ভাবতে গিয়ে তার মনে হলো, হাসপাতালের কারও সাহায্য পেলে ভাল হত। কার? যার মোটামুটি ক্ষমতা আছে। প্রথমেই মনে এল হারুণের কথা। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল তাকে। যে লোক লাশ গায়েব হয়ে যাওয়ার মত সিরিয়াস ব্যাপারকে গুরুত্ব না দিয়ে রসিকতা বলে উড়িয়ে দেয়, তাকে কিছু বিশ্বাস করানো সহজ হবে না। আর করাতে পারলেও তাকে দিয়ে কোন কাজ যে হবে, সে নিশ্চয়তা নেই।

তাহলে কাকে ধরবে?

ডা. হেমায়েত হোসেন? হ্যাঁ, হতে পারে। যেহেতু শিফট-ইন-চার্জ, ডাক্তার আর নার্সদের ব্যাপারে খবরা-খবর তাঁর ভালই থাকার কথা। সাফিয়া অনুপস্থিত থাকার কথা তাঁকে জানালে খোঁজ নিতে পারবেন।

ইস্, আয়না খালাটা এখন থাকলেও হত! এখানকার অনেক মানুষের সঙ্গেই তার খাতির, ভাল যোগাযোগ। ডাক্তার হেমায়েত হোসেনের সঙ্গে সরাসরি যদি নাও থাকে, অন্য কারও মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে কথা বলার একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতে পারত।

কিন্তু খালাটা সেই যে গেল তো গেলই। মনে হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের কোন দ্বীপ আর রাখবে না। সব চষেটষে তবেই ফিরবে।

আধঘণ্টা কেটে গেল। নতুন কিছু ঘটল না। মিসেস ইসলাম রান্নাঘর থেকে চলে গেছে। আর বসে থেকে লাভ নেই। ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাড়ির পাশ ঘুরে রাস্তায় এসে নামল কিশোর। আনমনা হয়ে হেঁটে চলল অন্ধকার রাস্তা ধরে।

আকাশে চাঁদ নেই। তারাগুলো মেঘে ঢাকা। অন্ধকার খুব বেশি। কবরস্থানটার কাছে এসে অকারণেই গা ছমছম করতে লাগল। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই তার। ওসবের ভয় করে না। কিন্তু তবু অদ্ভুত একটা অনুভূতি হতেই থাকল। মনে হলো, কেউ তার ওপর নজর রাখছে। পিছু নিয়েছে।

ফিরে তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না।

গোরস্থানটার দিকে তাকাল। এতই অন্ধকার, পাহাড়ের ঢালটাকে কালো একটা দেয়াল ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না।

ছিনতাইকারী না তো? ইদানীং ওদের অত্যাচার বড় বেড়েছে। সৈকত ও নির্জন এলাকাগুলোতে একা হাঁটা নিরাপদ নয়। কোথা থেকে যে ছায়ার মত এসে উদয় হবে, ঘিরে ধরবে, পেটে ছুরি ঠেকিয়ে পকেটগুলো সব খালি করে নিয়ে চলে যাবে, ঠিকঠিকানা নেই। বাধা দিলেই বিপদ। দেবে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে।

পকেটে টাকাপয়সা অবশ্য তেমন নেই। সঙ্গে দামী জিনিস বলতে কেবল হাতঘড়িটা আছে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে। একটা রিকশা পেলে হত।

হঠাৎ পেছনে মোটর সাইকেলের এঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ হলো।

ফিরে তাকাল সে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাইকেলটা। হেডলাইট জ্বলল। লাফ দিয়ে রাস্তায় উঠে তীব্র গতিতে ছুটে আসতে শুরু করল।

ও, ঠিকই জানান দিয়েছে তাহলে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ছিনতাইকারীই। ওরা মোটর সাইকেলে করেই বেশি আসে।

তৈরি হয়ে গেল কিশোর। একজন হলে কেয়ারও করে না। দুজন হলেই বা কি? সঙ্গে যদি ওদের ছুরি কিংবা পিস্তল না থাকে, পিটিয়ে হাড্ডি ভাঙবে আজ ব্যাটাদের। ভালমত কারাত আর জুজুৎসুর প্র্যাকটিস করে নেবে ওদের ওপর।

তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে মোটর সাইকেল। আলো পড়ল কিশোরের মুখে। অন্ধ করে দিল চোখ। গায়ের ওপর এসে পড়বে নাকি? ভাল কায়দা তো! ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে অসহায় করে তারপর হাতিয়ে নেবে যা নেবার।

লাফিয়ে সরে গেল সে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, মোটর সাইকেলের আলো ছাড়া।

ঘ্যাঁচ করে পাশে এসে ব্রেক করল মোটর সাইকেল। আরোহী মাত্র একজন। হাতে ছুরি বা পিস্তল দেখা গেল না। হেলমেটে ঢাকা থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না।

'কিশোর, তুমি এত রাতে এখানে?' বলে উঠল পরিচিত কণ্ঠ।

অবাক হয়ে গেল কিশোর। অরুণ।

ক্ষণিকের জন্যে কথা হারিয়ে ফেলল সে। কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না। মিনমিন করে শেষে বলল, 'হ্যাঁ, হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। এদিকটা অপরিচিত ছিল। ভাবলাম, যাই, দেখে আসিগে।'

'কিন্তু রাত দুপুরে কি দেখবে? রাস্তায় আলোও তো নেই যে কিছু দেখা যাবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আসার সময় অবশ্য এটা ভাবিনি। তুমি কেন এসেছিলে?'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

'কাজ ছিল।'

'কি কাজ?'

'জরুরী কিছু না। এখন বাড়ি যাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওঠো।'

'কেন?'

'বাড়ি পৌঁছে দেব।'

কোন দুরভিসন্ধি নেই তো অরুণের? এত রাতে ও এদিকে কেন এসেছিল, প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে গেল। দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। 'থাক না। আমি নাহয় রিকশায় করেই চলে যাব।'

'আরে ওঠো তো! রিকশা পেতে হলে অনেকখানি হাঁটতে হবে। কি করবে এই অন্ধকারে হেঁটে? দেখতে চাইলে দিনের বেলা বেরিয়ো। ছুটির দিনে আমার সঙ্গেও ঘুরতে পারো। কক্সবাজার দেখিয়ে দেব।'

আর কিছু বলল না কিশোর। উঠে বসল অরুণের পেছনে।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

তেরো

ঘরে যখন ফিরল, পিটির পিটির করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ঢুকেই দেখে আয়না খালা। কয়েক মিনিট আগে ফিরেছেন। ব্যাগ সুটকেসগুলো মেঝেতে রাখা। সরানো হয়নি তখনও। মুসা গেছে বাথরুমে। রবিন ডিউটি থেকে ফেরেনি।

দেখেই বলে উঠলেন খালা, 'চেহারাটা অমন ভূতের মত করে রেখেছিস কেন? কোথায় গিয়েছিলি?'

হেসে ফেলল কিশোর। 'কোনটার জবাব দেব? প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিতেই অনেক কথা বলা লাগবে।'

'বলা লাগলে বল। কি ঘটিয়েছিস? দুর্গতদের মধ্যে নিশ্চয় রহস্য নেই।'

'রহস্য নেই, পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা আছে নাকি?'

'তার মানে তদন্ত করতে গিয়েছিলি?'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মুসা। মুখচোখ শুকনো। পেটে হাত। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তদন্ত? পেয়ে গেছ নাকি একখান কেস?'

'তোমার কি হয়েছে? পেটে হাত দিয়ে রেখেছ কেন?'

'বোধহয় আমাশায় ধরেছে। চিনচিন ব্যথা।'

'তারমানে সহ্য করতে পারোনি দ্বীপের পানি। বোঝো তাহলে, ওসব খেয়েই কি করে বেঁচে আছে ওখানকার মানুষগুলো। বড় বেশি সহ্য ক্ষমতা।' খালার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'এত দেরি করলে কেন? কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?'

'বঙ্গোপসাগরের কোন দ্বীপ আর বাকি রাখেননি খালা,' একটা চেয়ারে বসে পড়ল মুসা। 'উফ্, ঘোরাতে ঘোরাতে মেরে ফেলেছেন। আর যা পচা গরম। বাপরে বাপ! দ্বীপ না, নরক!'

হাসলেন খালা, 'জনসেবা অত সহজ না।'

'অন্তত বাংলাদেশে,' কিশোর বলল। 'আমিও সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।'

'কেন, হাসপাতালে কাজ করতে ভাল্লাগছে না?'

'লাগবে কি? চাকরের কাজ করায়।'

'তাই নাকি?' গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন খালা, 'তাওয়ালির মা? চা দিতে কতক্ষণ লাগবে?'

'হইয়ে গেসে, আম্মা।'

মিনিটখানেক পরই চা-নাস্তার ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল বুয়া। টেবিলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

খাবারের দিকে নির্বিকার চোখে তাকিয়ে রইল মুসা। হাত বাড়াল না।

খালা শুধু চা নিলেন। নাস্তা খেলে আর রাতে ভাত খেতে পারবেন না। মুসাকে বললেন, 'একটা কিছু অন্তত মুখে দাও।'

'আমার পেট ব্যথা করছে,' বলে এক গেলাস পানি ঢকঢক করে

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

খেয়ে ফেলল মুসা।

'বেশি খারাপ নাকি? ট্যাবলেট লাগবে?'

'রাতটা দেখি। সকালে না সারলে তখন খেয়ে ফেলব।'

কিশোরের দিকে তাকালেন খালা, 'তুই এখন কোত্থেকে এলি?'

'ভূতের গলি থেকে।'

আঁতকে উঠল মুসা। 'খাইছে! ভূত?'

খালাও অবাক। 'এখানে ভূতের গলি পেলি কোথায়?'

'আমি না, হিরণ মিয়া পেয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে গেল খালার। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বোনপোর মুখের দিকে। 'তুই কি সব সময়ই এমন করে কথা বলিস নাকি?'

জোরে হাসতে গিয়ে পেটে টান পড়ায় আঁউ করে উঠল মুসা। 'আপনি ওর দেখেছেন কি, খালা। নাটকীয়তা, হেঁয়ালি করে বলা, এসব বদভ্যাস ওর এত বেশি, বিরক্ত করে ফেলে। নিজে খুব মজা পায়। আমাদের এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'হিরণ মিয়াটা কে?'

'রিকশাওয়ালা।' কোন রাস্তাটার নাম ভূতের গলি রেখেছে হিরণ মিয়া, বুঝিয়ে বলল কিশোর।

'ওখানে গিয়েছিলি কেন?' খালার প্রশ্ন।

'গিয়েছিলাম কি আর সাধে? একটা বাচ্চা ছেলের মা তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করছিল। কেন করছে, জানতে।'

হাল ছেড়ে দিলেন খালা। ছেলের সঙ্গে মায়ের খারাপ আচরণের মধ্যে রহস্য কোথায়, মাথায় ঢুকল না তাঁর। চায়ের

কাপটা পিরিচে নামিয়ে রেখে হতাশ ভঙ্গিতে হেলান দিলেন চেয়ারে।

কিশোরের স্বভাব জানা আছে মুসার। সে হতাশ হলো না। বরং আগ্রহ দেখা দিল চোখের তারায়। 'কি ব্যাপার, বলো তো? জটিল কোন রহস্য নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে হাসপাতালে। একজন নার্স খুন হয়েছে। তারই তদন্ত করছি।'

আবার পিঠ সোজা হয়ে গেল খালার। 'খুন!'

'হ্যাঁ। লাশটা আমিই প্রথম আবিষ্কার করি। ফিরে এসে ডাক্তার আর সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে গিয়ে দেখি উধাও।'

'নির্ঘাত ভূত! অপঘাতে মৃত্যু তো। মরে ভূত হয়ে গেছে। তোমরা যাওয়ার আগেই উঠে চলে গেছে তার আসল জায়গায়। ভূতের গলিতে কি ওটাকে খুঁজতেই গিয়েছিলে নাকি?'

'দাঁড়াও, বাথরুম থেকে আসি। তারপর বলছি সব।'

উঠে চলে গেল কিশোর। মিনিট কয়েক পর ফিরে এসে দেখে রবিনও বসে আছে। ডিউটি থেকে ফিরেছে।

গোড়া থেকে সব বলতে লাগল কিশোর। রবিন চুপচাপ রইল। খালাও কোন প্রশ্ন করলেন না। কেবল মুসা মাঝেমধ্যে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করল।

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় সে এতক্ষণ অনেক কষ্ট সহ্য করে বসে থেকেছে। আর পারল না। দৌড় দিল বাথরুমে।

'আমি শিওর,' কিশোর বলল, 'দিপুর সঙ্গে নার্স সাফিয়ার খুনের কোন সম্পর্ক আছে। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে ক্যান্সার

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

হাসপাতালে।'

ঝিম মেরে রইলেন খালা।

কিশোর বলল, 'তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?'

'করব না কেন? করছি। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি। এসব বিপদের মধ্যে তোর যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। পুলিশকে জানানো দরকার। আমি এখনি ফোন করছি।'

'না না, খালা,' বাধা দিল কিশোর, 'ও কাজও কোরো না। ওরাও আমার কথা বিশ্বাস করবে না। হেসে উড়িয়ে দেবে...'

'সাফিয়ার খোঁজ-খবর তো করতে পারবে?'

'সাফিয়া নয়, সাফিয়ার লাশের। বিশ্বাসই যদি না করে, খোঁজ করতে যাবে কোন দুঃখে? ওদের লাগবে না। হাসপাতালের কারও সাহায্য পেলে লাশটা আমিও খুঁজে বের করতে পারব।'

'কার সাহায্য চাস?'

'শিকদার হেমায়েত হোসেন। চাইল্ড স্পেশালিস্ট।'

'ঠিক আছে, বলব তাঁকে।'

'পরিচয় আছে?'

মুচকি হাসলেন খালা। 'একটা কথা তুই জানিস না। ওই হাসপাতালের জায়গা সবটা কিনে নেয়নি কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যে দান-খয়রাতের ব্যাপারও আছে। ওখানে তোর খালুর জায়গা ছিল অনেকখানি। কিনে নিতে চেয়েছিল ওরা, কিন্তু টাকা নিতে রাজি হননি তিনি। দান করে দিয়েছেন। সেই কারণে হাসপাতালের বোর্ড অভ ট্রাস্টির একজন সদস্য করে নেয়া হয়েছে আমাকে। কাল সন্ধ্যায় একটা মীটিং আছে ওখানে। আমাকেও

যেতে হবে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। 'তাহলে তো আর কথাই নেই। তুমি তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগটা করিয়ে দাও। তাঁকে সব খুলে বলব। তিনি যদি মনে করেন, পুলিশকে খবর দেয়া দরকার, তাহলে দেবেন।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন খালা। 'তা অবশ্য মন্দ বলিসনি। হাসপাতালের ঘটনা। পুলিশকে জানালে ওখানকার লোকেই জানাক। রাত হয়ে গেছে। আজ আর ডাক্তারকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। কাল সকালে ফোন করব। তোর আর যাওয়ার কি দরকার? আমিই তাঁকে বলে দেব সব।'

'না, তোমার বলাটা ঠিক হবে না,' কেসের তদন্ত এখনও অনেক বাকি। সে মজা থেকে বঞ্চিত হতে চায় না কিশোর। 'খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে পারবে না। বলতে হবে আমাকেই।'

কিশোরের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন খালা। 'তা বটে। ঠিক আছে, তুইই বলিস।'

'কাল আর ত্রাণ বিতরণে বেরোচ্ছ না?'

'এখনও জানি না। সকালে সমিতির স্টোর কিপারের সঙ্গে কথা বললে জানা যাবে চাঁদা আর জিনিসপত্র কতটা জমেছে। খালি হাতে বেরোনোর কোন মানে হয় না। সব না খেয়ে আছে ভুখা মানুষের দল। ইস্, কি যে কষ্ট ওদের না দেখলে বুঝবি না। পেটে খাবার নেই। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে মাথায় কলাপাতা দিয়ে বসে থাকে। মাথা গোঁজার ঠাইটুকুও উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়। ছোট ছোট দুধের

বাচ্চাগুলো ভিজে চুপচুপে হয়ে কুঁকড়ে গিয়ে লেপ্টে থাকে মায়ের বুকের সঙ্গে। কঙ্কালসার দেহ। পড়ে পড়ে কাতরায় জখমী মানুষ। এ দৃশ্য কি সওয়া যায়!'

'থাক, আর বোলো না,' হাত নাড়ল কিশোর। 'ভাল্লাগে না শুনতে।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

চোদ্দ

পরদিন সকালে খোলা জানালা দিয়ে ঝোড়ো বাতাস এসে ঝাপটা দিয়ে ঘুম ভাঙাল কিশোরের। প্রথমে একটা চোখ মেলল, তারপর আরেকটা। তাকাল বাইরের দিকে। মুখ গোমড়া করে রেখেছে মেঘলা আকাশ। দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। এই আবহাওয়া মোটেও ভাল লাগে না। কেমন বিষণ্ণ ধূসর আলো। এরচেয়ে বৃষ্টি হওয়া অনেক ভাল।

সাগরের গর্জন কানে আসছে। ফুঁসছে সাগর। বছরের এ সময়টায় মেজাজ খুব খারাপ থাকে বঙ্গোপসাগরের। এই ভাল তো এই খারাপ। যখন তখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। বুক কাঁপে দ্বীপবাসী আর সাগরপাড়ের মানুষের।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি ওর। থেকে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। শরীরটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে।

আয়না খালা ডাক দিলেন দরজায় থেকে, 'অ্যাই, কিশোর, ওঠ। অনেক বেলা হলো।'

গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে উঠে বসল কিশোর। নামল বিছানা থেকে। আজ আর হাসপাতালে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে

নেই। এক্স-রে রুমে কাজ করে ভলান্টিয়ারির সাধ মিটেছে। ভাবছে খালার সঙ্গে ত্রাণ বিতরণ করতেই চলে যাবে। যেতও তাই। কিন্তু রহস্যটার কিনারা করতে হলে এখন কক্সবাজার থেকে নড়া উচিত হবে না ওর। হাসপাতালের কাজ ছাড়াটা তো আরও অনুচিত।

বাথরুম সেরে রান্নাঘরে ঢুকল সে। ওখানে টেবিলে নাস্তা দেয়া হয়েছে। রবিন ওর আগেই উঠেছে। মুসা বিছানায়। ওর অসুখ বেড়েছে।

রুটিতে মাখন মাখাচ্ছেন আয়না খালা। কিশোরকে দেখে মুখ তুললেন, 'আয়, বোস। মুখ অমন ফোলা কেন? ঘুম হয়নি?'

'হবে কি?' হেসে বলল রবিন, 'যতক্ষণ ওই রহস্যের কিনারা না হবে, ওর আর স্বস্তি নেই।'

খালা বললেন, 'তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারিস, কিনারা করে ফেল। মাথায় রহস্যের জট নিয়ে দুর্গত মানুষের সেবা করতে পারবি না। আমি ফোন করে বলে দিয়েছি ডাক্তার শিকদারকে। তোকে যেতে বলেছেন।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর, 'কখন?'

'নাস্তা খেয়েই চলে যা। তোর সঙ্গে দেখা করে তারপর হাসপাতালে যাবেন।'

নাকেমুখে খাবার গুঁজতে আরম্ভ করল কিশোর।

'আরে আস্তে খা। গলায় আটকাবে তো।'

রবিন জানতে চাইল, 'আমি আসব তোমার সঙ্গে?'

খালা মানা করলেন, 'নাহ্, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি শুধু কিশোরের কথা বলেছি।'

খালাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তুমি ডাক্তার সাহেবকে সব বলেছ নাকি?'

'না। আমি শুধু বলেছি, আমার বোনপো কিশোর পাশা হাসপাতালে স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারি করতে গিয়ে কি নাকি গণ্ডগোল হতে দেখেছে। আপনাকে জানানো দরকার মনে করছে। আপনি একটু ভালমত তার কথা শুনবেন।'

'তিনি কি বললেন?'

'শুনবেন। আবার কি।'

খাওয়ার পর দেরি করল না কিশোর। রওনা হয়ে গেল। ঠিকানা জেনে নিয়েছে খালার কাছে। রিকশায় যেতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।

বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যা করছেন ডাক্তার শিকদার। কিশোরকে রিকশা থেকে নেমে গেট খুলতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কাছে যেতে বললেন, 'তুমিই কিশোর পাশা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এখানেই কথা বলতে চাও? না বসবে?'

'বসলেই ভাল হয়। অনেক কথা।'

ফুলগাছে পানি দেয়ার ঝাঁঝরিটা নামিয়ে রেখে ডাক্তার বললেন, 'এসো।'

চমৎকার সাজানো-গোছানো হলঘরে এনে কিশোরকে বসালেন ডাক্তার। বিয়ে-থা করেননি। চাকর-দারোয়ান-ড্রাইভার নিয়ে থাকেন। চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। কিশোর বলল, খাবে না। এইমাত্র বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে। ডাক্তার তখন বললেন,

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

'ঠিক আছে, বলো তাহলে, কি গোলমাল হতে দেখেছ হাসপাতালে?'

ভূমিকার মধ্যে গেল না কিশোর। সরাসরি বলল, 'সাফিয়া নামে একজন নার্স খুন হয়েছে। সেকেণ্ড উইঙে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। ফিরে এসে নার্স বিশাখাকে বললাম। সে ডাক্তার হারুণ আর দুজন সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে আনাল। সবাই মিলে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি লাশটা নেই। কেউ ততক্ষণে সরিয়ে ফেলেছে। আমার কথা আর বিশ্বাস করছে না এখন।'

পিঠ সোজা করে ফেলেছেন ডাক্তার শিকদার। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন কিশোরের মুখের দিকে। 'খুনীকে দেখেছ?'

'না। শুধু লাশটা দেখেছি। সেকেণ্ড উইঙের মেঝেতে পড়ে ছিল। গলায় একটা সার্জিক্যাল নাইফ গাঁথা। মরা, কোন সন্দেহ ছিল না আমার। তাই দৌড়ে গিয়ে নার্স বিশাখাকে খবর দিয়েছিলাম।'

রেগে গেলেন ডাক্তার শিকদার, 'এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, আর আমাকে কেউ কিছু বলল না!'

'লাশটা পরে আর পাওয়া যায়নি বলে হয়তো বলেনি। ডাক্তার হারুণ বললেন, তাঁর এক কলিগ ডাক্তার হান্নান নাকি রসিকতা করে মর্গের বেওয়ারিশ লাশ ফেলে গিয়েছিলেন। আমি দেখে আসার পর আবার তুলে নিয়ে গেছেন। সেজন্যে পরে গিয়ে আর পাওয়া যায়নি।'

গম্ভীর হয়ে বললেন ডাক্তার শিকদার। 'কি নাম বললে নার্সের?'

'সাফিয়া খাতুন। চিলড্রেন্স ফ্লোরে ডিউটি দিত।'

'চিনেছি। তুমি বলছ সে খুন হয়েছে?'

'তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। সেদিন সন্ধ্যার পর আর তাকে হাসপাতালে দেখিনি। নার্স বিশাখাকে জিজ্ঞেস করলাম, সাফিয়া হাসপাতালে আসে না কেন? বলতে পারল না। ও কিছু জানে না। সাফিয়ার সঙ্গে এরপরে আর দেখাও হয়নি তার।'

'এতবড় একটা ঘটনা···কেউ জানাল না আমাকে···' আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে ফোনের দিকে সরে বসলেন তিনি। 'দাঁড়াও দেখছি।' পাশের টিপয়ে রাখা রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন। 'হালো, মিসেস রাহেলা?···আমি ডাক্তার হেমায়েত। শুনুন, নার্স সাফিয়ার একটা খোঁজ নিন তো। হাসপাতালে নাকি আসছে না। কোথায় গেছে ও দেখুন।···আছি, আমি লাইনেই আছি।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রিসিভারের মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে ডাক্তার শিকদার বললেন, 'নার্স সুপারভাইজার।'

কিশোর বলল, 'চিনি। আমাকে চিলড্রেন্স ফ্লোর থেকে তিনিই এক্স-রে রুমে বদলি করেছেন।'

কথাটা যেন শুনতে পেলেন না ডাক্তার। অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। চোখ বুজে হেলান দিলেন সোফায়। মিনিটখানেক পর সজাগ হয়ে উঠলেন আবার, চোখ মেলে বললেন, 'হালো।···হ্যাঁ, আছি। বলুন।' আধ মিনিট চুপচাপ ওপাশের কথা শুনলেন। তারপর বললেন, 'ভালমত দেখেছেন? দরখাস্ত আছে? ও, তাহলে তো মিটেই গেল। ঠিক আছে। রাখলাম। থ্যাংক ইউ।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে কিশোরের দিকে তাকালেন ডাক্তার শিকদার। 'নার্স সাফিয়া ছুটিতে গেছে। রেজিস্টারে এনট্রি আছে।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

তার দরখাস্তও আছে। তুমি কবে যেন তার লাশ দেখেছ বললে?'

'পরশুদিন সন্ধ্যায়।'

'হ্যাঁ, পরশুদিনই ছুটির দরখাস্ত করেছে ও। কাল থেকে অনুপস্থিত।' দ্বিধা করতে লাগলেন ডাক্তার শিকদার। কিশোরকে বলতে যেন বাধছে এরকম ভঙ্গিতে বললেন, 'আমারও ধারণা তোমার দেখায় ভুল হয়েছে। নার্স সাফিয়ার লাশ তুমি দেখোনি। হারুণের কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে আমার। হান্নান ওর সঙ্গে রসিকতা করেছে। ওরকম সে মাঝে মাঝে করে। ওর আরও একজন কলিগের সঙ্গে করেছে। এমনকি নাইটগার্ডকেও রেহাই দেয়নি। রাত দুপুরে একদিন লাশকাটা ঘরে শব্দ শুনে দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েছিল গার্ড। দেখে সাদা পোশাক পরা লম্বা একটা ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা কাটা লাশের চারপাশে। দারোয়ান তো ভয়ে অজ্ঞান। সেবাযত্ন করে হান্নানই তখন তার হুঁশ ফিরিয়েছে। হাহ্ হাহ্! নিশ্চয় বুঝতে পারছ ভূতটা কে ছিল?'

উসখুস করতে লাগল কিশোর। ডাক্তার শিকদারকেও বিশ্বাস করাতে পারল না। এখন কি করবে? কি করে খুঁজে বের করবে সাফিয়ার লাশ?

'কি ভাবছ?' জানতে চাইলেন ডাক্তার শিকদার।

'আরও একটা ঘটনা ঘটেছে, স্যার। একটা বাচ্চা ছেলে এসেছিল চিকিৎসা নিতে। চিলড্রেন্স ফ্লোরে সতেরো নম্বর কেবিনে ছিল। এখন চলে গেছে। ওর মা ওর সঙ্গে ঠিক মায়ের আচরণ করে না। ওদের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে দেখে এসেছি আমি। অন্য আরেকজন মহিলা আর একটা লোককে দেখেছি জোর করে

ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে। আমার বিশ্বাস, এর সঙ্গে সাফিয়ার কোন সম্পর্ক আছে।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল ডাক্তারের। 'কি সম্পর্ক?'

'বুঝতে পারছি না। খোঁজ করলেই বেরিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেলেও এক কথা ছিল। কিন্তু বাড়িতে কোন মা তার ছেলেকে কার হাতে তুলে দিল, সেটা আমার জানার বিষয় নয়। তবু, যাই হোক, ছেলেটার নাম কি? কি অসুখ হয়েছিল?'

'তরিকুল ইসলাম দিপু। নিউমোনিয়া হয়েছিল। ভূতের গলি···ইয়ে, ওই যে পাহাড়ের গায়ে পুরানো কবরস্থানটা আছে না খ্রীষ্টানদের, আর নিচে রাস্তার ধারে বাসা। বয়েস পাঁচ বছর কয়েক মাস। বিপদের মধ্যে আছে ছেলেটা। হাসপাতালে থাকতে সারাক্ষণ কেঁদেছে। বাড়িতেও একই অবস্থা। আমার মনে হয়, মহিলা খুব মারে ওকে।'

'কান্নাটাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না। বাচ্চারা কাঁদেই। রোগ হলে তো আরও বেশি। তবে ওর ব্যাপারে···কি নাম যেন বললে?'

'দিপু।'

'হ্যাঁ, দিপু। ওর ব্যাপারে খোঁজ একটা নেয়া যাবে। আমাদের হাসপাতালে রিলিজ করে দেয়ার পরেও রোগীকে একবার অন্তত চেকআপ করাতে নিয়ে আসার নিয়ম। কোন্‌দিন আনতে হবে রিলিজ কার্ডে ডেট দিয়ে দেয়া হয়। সেটা রেজিস্টারেও লেখা থাকে। নার্স সুপারভাইজারকে আমি বলে দেব, ছেলেটাকে চেকআপ করাতে আনলে যেন আমাকে খবর দেয়া হয়। কোন্‌দিন

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

আনবে ওকে রেকর্ড দেখলেই জানা যাবে···'

'রেকর্ড পাওয়া যাবে না,' বলে ফেলল কিশোর। 'রেকর্ড রুমে আমি নিজে খুঁজে দেখেছি। ফাইলটা নেই।'

'সব কিছুকেই কি গায়েবীতে ধরল নাকি? লাশ, মানুষ, ফাইল···' ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ ডাক্তার শিকদার। ধীরে ধীরে সহানুভূতির হাসি ফুটল মুখে। 'কিছু মনে কোরো না, কিশোর, তোমাকে একটা কথা বলি। ওই ভলান্টিয়ারির কাজ তুমি ছেড়ে দাও। এসব আজেবাজে খাটুনির কাজ তোমার জন্যে নয়। ভীষণ মানসিক চাপ পড়েছে তোমার ওপর। অভ্যাস নেই তো, স্নায়ুগুলো সইতে পারছে না। তুমি বরং বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নাও।'

'আপনি কি আমাকে হাসপাতালে যেতে নিষেধ করছেন?'

'যেতে যদি ইচ্ছে করে অবশ্যই যাবে। তবে অন্যের সেবা করতে গিয়ে তোমার নিজের ক্ষতি করার পক্ষে মত দিতে পারব না আমি।'

'হাসপাতালে কাজ করতে খারাপ লাগছে না আমার। তবে ওই এক্স-রে রুমটা থেকে মুক্তি চাই। ও জায়গাটা আমার পছন্দ নয়। তারচেয়ে যদি আবার চিলড্রেন্‌স ফ্লোরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারতেন, ভাল হত। নার্স সুপারভাইজারকে কি আপনি একটু বলে দেবেন?'

ঠোঁট কামড়ালেন ডাক্তার শিকদার। 'ঠিক আছে, বলব। কিন্তু আজ তো হবে না, বিষ্যুৎবার, ঝামেলা। ওর সঙ্গে দেখাই হবে না আমার। কাল শুক্রবার, হাসপাতালের অফিস ছুটি। তবে পরশু

থেকে চিলড্রেন্স ফ্লোরে ডিউটি করতে পারবে। কথা দিলাম, যাও।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার, আপনাকে।'

হাসলেন ডাক্তার। 'আমাকে সব কথা জানিয়ে ভাল করেছ। ওই ছেলেটার ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার ব্যবস্থা আমি জরুরী ভিত্তিতে করব। ওর ফাইলটা রেকর্ড রুম থেকে কোথায় গেল, তাও দেখব। আজ তো আর হাসপাতালে যাচ্ছ না, নাকি?'

'না, যাব।'

'এক্স-রে রুমে নাকি কাজ করতে ভাল লাগে না?'

'তাও করব,' হাসল কিশোর। 'একটা দিনই তো মাত্র। কাটিয়ে দিতে পারব। শনিবার থেকেই তো মুক্তি।'

'তোমাকে অসুস্থ বলায় রাগ হয়েছে, না? জেদ করে যেতে চাইছ?'

'না না, কি যে বলেন, স্যার। রাগ করব কেন? স্নায়ুর ওপর চাপ তো সত্যি পড়ছে। আমি ভেবেছি আহত, অসুস্থ মানুষের সেবা করব। আমাকে দিয়ে করানো হয় পিয়ন আর বয়ের কাজ। এটা কেন ভাল লাগবে আমার, বলুন?'

'লাগার কোন কারণ নেই। তুমি তো তাও লেগে আছ, আমি হলে কবে দু'এক ব্যাটাকে চড়-থাপ্পড় মেরে চলে যেতাম। আসলে ওরা মানুষের কদর করতে জানে না। ওদের মত অমানুষের জন্যেই দেশটার আজ এই অধঃপতন। দুরবস্থা।' উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। এগিয়ে এসে হাত রাখলেন কিশোরের কাঁধে। 'হাসপাতালে যে কোন সমস্যা হোক, চলে আসবে আমার কাছে। একটুও দ্বিধা নয়।

আমার দরজা তোমার জন্যে সব সময় খোলা।'

'সে তো বুঝতেই পারছি, স্যার। আয়না খালারও আপনার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা।'

'ওসব বাড়িয়ে বলা। উনি একটু বেশি পছন্দ করেন আমাকে।' ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার শিকদার।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। থ্যাংক ইউ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

পনেরো

ডাক্তার শিকদারের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছে, বাড়ি ফিরে দুই সহকারী গোয়েন্দা আর আয়না খালাকে সব জানাল কিশোর। ইউনিফর্ম পরে হাসপাতালে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো সে আর রবিন। মুসার অবস্থা কাহিল। আমাশয় খুব বেড়েছে। মোবারক আলিকে পাঠিয়ে দোকান থেকে অ্যামোডিস ট্যাবলেট আনিয়ে দিয়েছেন খালা।

মুসার যা অবস্থা, তাতে ওকে বুয়া আর মোবারক আলির জিম্মায় রেখে বেরোনোটা উচিত মনে করলেন না তিনি। বেশি ঘোরাঘুরি করে তাঁর শরীরটাও তেমন ভাল নেই। জ্বরটর উঠে গেলে শেষে মুশকিলে পড়ে যাবেন। সমিতির অফিসে ত্রাণ যা জমা পড়েছিল, সব প্রায় শেষ। আবার জমা পড়ার অপেক্ষা করতেই হবে। শুধু শুধু খালি হাতে দুর্গত অঞ্চলে ঘোরার কোন মানে হয় না। তাছাড়া বিকেলে হাসপাতালের মীটিং তো আছেই। তেমন জরুরী কোন কাজ না পড়লে ওটাতে অনুপস্থিত থাকতে চান না। অতএব সেদিনটা বাড়িতে কাটানোই মনস্থ করলেন।

রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। হাসপাতালে যাবার পথে

অন্য দিনের মতই স্কুলের সামনে রিকশা থেকে ওকে নামিয়ে দিল।

সেদিনটাও একঘেয়ে সময় কাটল এক্স-রে রুমে। কোন পরিবর্তন নেই। বিকেলে শিফটিঙের সময় হলে বেরিয়ে পড়ল। রবিনের স্কুলে গেল ওকে নেয়ার জন্যে। সেদিনও কাজের চাপ বেশি ওর। কিশোরকে বলল, বেরোতে পারবে না। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে।

কি আর করে। বাড়ি ফিরে কাপড় বদলে চা খেয়ে নিল কিশোর। ট্যাবলেট খেয়েও মুসার পেটের উন্নতি হয়নি। ভালমত ধরেছে। মনে হচ্ছে শুধু অ্যামোডিসে কাজ হবে না, কড়া অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে। বিছানায় নেতিয়ে পড়ে আছে ও। অতিমাত্রায় কাহিল। বেরোনোর প্রশ্নই ওঠে না।

আয়না খালা সমিতির অফিসে গেছেন। ওখান থেকে যাবেন হাসপাতালে।

বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগল না। একা একাই সৈকতে বেড়াতে চলল কিশোর।

দোকানপাটগুলোর কাছটায় ভিড় বেশি। ওখানে ভাল লাগল না। সৈকতের বালি মাড়িয়ে হেঁটে চলল পর্যটনের মোটেলটার দিকে। ঝাউগাছের পাশ দিয়ে এগোল ধীরে ধীরে।

একটা বালির ঢিবির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ধড়াস করে লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল, পর্যটনের রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ানো একটা গাড়ির দরজার তালা খুলছে মিসেস ইসলাম। ওর পাশে দাঁড়ানো দিপু। কিশোরের দেয়া ভালুকটা একহাতে পেঁচিয়ে চেপে ধরে রেখেছে বুকের সঙ্গে।

আগের চেয়ে অনেক সুস্থ লাগছে ওকে।

ঘটনাটা কি? এই ভাল, এই খারাপ। ক্ষণে ক্ষণে চেহারার পরিবর্তন হয় নাকি ওর!

দৌড় দিল কিশোর। ডাকল, 'দিপু!'

ফিরে তাকাল ছেলেটা। চিনতে পারল কিশোরকে। হাসল।

মিসেস ইসলামও ফিরে তাকাল। কিশোরকে দেখে কঠোর হয়ে গেল চেহারা। দিপুর হাত ধরে একটানে ওকে গাড়ির ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে ঘুরে চলে গেল ড্রাইভিং সীটের দরজার কাছে। উঠে বসল তাড়াহুড়ো করে। স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। আর এগিয়ে লাভ নেই। দিপুর সঙ্গে কথা বলতে দেবে না ওকে মিসেস ইসলাম। দাঁড়াবেই না।

চলতে আরম্ভ করল গাড়িটা।

তাকিয়ে আছে কিশোর। রাতে কি সেদিন মিসেস ইসলামের বাড়িতে এই গাড়িটাই দেখেছিল? ঠিক চিনতে পারল না। অন্ধকারে দেখেছিল। তবে মনে হলো এটা সেই গাড়িটাই।

আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দকে ছাপিয়ে ভারি গুড়গুড় শোনা গেল দূরে। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। আকাশের অবস্থা ভাল না। ঘন কালো মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। দিগন্তে কালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। ঝড় আসছে। তাড়াতাড়ি দোকানগুলোর দিকে রওনা হলো সে। ওখানে গেলে রিকশা পাওয়া যাবে।

নির্জন হয়ে এসেছে এলাকাটা। আকাশের অবস্থা খারাপ দেখে বেশির ভাগ মানুষই চলে গেছে। দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে রিকশা পেতে অসুবিধে হলো না।

বাড়ি ফিরে দেখে অন্ধকার। বিদ্যুৎ চলে গেছে। বারান্দায় বসে

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

আছে মোবারক আলি। একটা মোম জ্বেলে ধরিয়ে দিল কিশোরের হাতে। ওর কাছে জানতে পারল রবিন ফেরেনি তখনও।

মুসার ঘরে মোম জ্বলছে। বিছানায় তেমনি নেতিয়ে আছে সে। কিশোরের সাড়া পেয়ে চোখ মেলল। জানতে চাইল কি খবর।

দিপুকে ওর মায়ের সঙ্গে দেখার খবর বলল ওকে কিশোর।

ঝিলিক দিয়ে উঠল বিদ্যুতের নীল আলো। ক্ষণিকের জন্যে আলোকিত করে দিয়ে গেল ঘরটা।

কয়েক মিনিট পর বাতি জ্বলল। ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে।

বেশিক্ষণ কথা বলতে পারল না মুসা। কাহিল লাগে। ওকে ঘুমানোর চেষ্টা করতে বলে বসার ঘরে চলে এল কিশোর। টেলিভিশনটা অন করে দিল।

আয়না খালাও ফেরেননি। একা একা টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে রইল সে। খিদে পেয়েছে। বুয়াকে ডেকে হালকা কিছু খাবার দিতে বলল। রাতে আয়না খালা আর রবিন ফিরলে একসঙ্গে বসে ভাত খাবে।

টেলিভিশনের দিকে তাকিয়েই থাকল কেবল কিশোর, মন বসাতে পারল না। দিপুর কথা ভাবছে। জোর করে ছেলেটাকে বিদায় করল মিসেস ইসলাম। সঙ্গে সুটকেসও দিয়ে দিল। তারমানে বেশ কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা। তাহলে অত তাড়াতাড়ি আবার নিয়েই বা এল কেন?

দিপু যে বিপদের মধ্যে রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ওর। ডাক্তার শিকদারের অপেক্ষায় থাকলে অনেক সময় নষ্ট হবে। এখনই কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করবে?

দিপুর অবস্থা জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল সে। শেষে আর থাকতে না পেরে লাফিয়ে উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিল টেলিভিশন। ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর টিপতে আরম্ভ করল। হাসপাতালে দিপুর চার্টে দেখেছিল নম্বরটা। মুখস্থ করে রেখেছে।

অনেকক্ষণ রিং হবার পর ওপাশ থেকে একটা খসখসে গলা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে সাড়া দিল, 'হ্যালো?'

'কে? মিসেস ইসলাম? আমি কিশোর বলছি। কিশোর পাশা। সেদিন আপনার কাছে রেড ক্রসের একটা টিকিট বিক্রি করে এসেছি। টাকা নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু-টিকিটটা দিয়েছি কিনা মনে করতে পারছি না। না দিয়ে থাকলে ভীষণ অন্যায় হয়ে যাবে।'

'জাহান্নামে যাক তোমার টিকিট!' চেঁচিয়ে উঠল মিসেস ইসলাম। 'জ্বালাতন করে মারল! আমার পেছনে লেগেছ কেন বলো তো? আমি এখন ব্যস্ত। কথা বলতে পারব না...'

'প্লীজ, মিসেস ইসলাম, রাখবেন না! দিপুর সঙ্গে একটু কথা বলতে দেবেন?'

'না! তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের পেছনে লাগলে ভাল হবে না...এই হারামজাদা, এখানে কি?' চিৎকার করে উঠল মিসেস ইসলাম। 'সর!' ঠাস করে চড় মারার শব্দ হলো। লাইন কেটে যাওয়ার আগে বাচ্চা ছেলের চিৎকার কানে এল কিশোরের।

এত জোরে একটা শিশুকে চড় মারল! আর সহ্য করতে পারল না ও। এর একটা বিহিত আজ রাতেই করবে। বুয়াকে ডেকে বলল, 'বুয়া, মুসাকে দেখো। আমি বাইরে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরব।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

ষোলো

মোবারক আলির সাইকেলটা চেয়ে নিয়ে ভূতের গলিতে রওনা হলো কিশোর। গাড়ি আছে আয়না খালার। এখন গ্যারেজে। ওভারহোলিঙের জন্যে দিয়েছেন। তবে ওটা থাকলেও নিত না সে। ভূতের গলির মত নীরব, অন্ধকার জায়গায় গাড়ির শব্দ, আলো, দুটোই খুব সহজে চোখে পড়বে। বাড়ির কাছাকাছি থামতে দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে মিসেস ইসলাম।

মেইন শহরেই আলো কম। পাহাড়ী রাস্তায় তো কালিগোলা অন্ধকার। তবে তাতে খুব একটা অসুবিধে হলো না কিশোরের। কারণ ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

সাইকেল চালাতে চালাতে ভাবছে সে। কি করবে? বাড়িতে ঢুকবে? বের করে আনবে দিপুকে? যদি সে আসতে না চায়?

আকাশের এমাথা ওমাথা চিরে দিল বিদ্যুতের শিখা। বিকট শব্দে বাজ পড়ল কাছে কোথাও। কানে তালা লেগে গেল। ঝড়ের আর দেরি নেই।

বাড়িটার কাছে এসে একটা ঝোপের আড়ালে সাইকেলটা লুকিয়ে রাখল সে। আগের দিন যেদিক দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের কাছে

গিয়েছিল সেপথটা ধরেই এগোল। ওটা দিয়ে গেলে সুবিধে। ঝোপঝাড়ের আড়াল থাকায় জানালা দিয়ে যদি কেউ নজর রেখে থাকে, বিদ্যুতের আলোতেও সহজে চোখে পড়বে না ওকে।

জানালার নিচে এসে থামল ও। আলো নেই ভেতরে। তারমানে কেউ নেই এ ঘরে। ঢোকার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ঢুকবে কিভাবে? জানালায় তো শিক। তবে ওর ভাগ্য সহায়তা করল। দরজাটাতে ছিটকানি লাগানো নেই। ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। বেশি উত্তেজিত না থাকলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগত ওর কাছে। কারণ এমন ঝোড়ো রাতে এ রকম নিরালা একটা বাড়িতে কেউ ছিটকানি খুলে রাখে না। ভুল করে রাখলেও বেশিক্ষণ সেটা অগোচরে থাকত না। বাতাসে ঝটকা দিয়ে খুলে ফেলত দরজা।

যাই হোক, কোন কিছু না ভেবেই ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। পায়ে রবার সোলের কেডস জুতো। শব্দ হলো না। কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে এগোতে গিয়ে ধাক্কা লাগিয়ে বসল একটা টেবিলের কোণায়। কাঁচের একটা বাটি মাটিতে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙল।

চমকে গেল সে। দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। কান পাতল পায়ের শব্দ শোনার জন্যে।

কিন্তু বাটি ভাঙার শব্দটা মনে হয় কারও কানে যায়নি। দেখতে এল না কেউ।

আবার পা বাড়াল সে। ভেতরের দরজার দিকে এগোল।

ঠিক দরজাটার কাছাকাছি গিয়ে বিপদটা টের পেল। মনে হলো দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা ছায়া নড়ে উঠল। কিন্তু কিছু করার নেই আর তার। দেরি হয়ে গেছে। বাড়ি পড়ল ঘাড়ে। তীব্র একটা

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

ব্যথা। মনে হলো মাথাটা ছিঁড়ে গেল বুঝি ধড় থেকে। জ্ঞান হারাল সে।

জ্ঞান ফিরতে বুঝল হাত-পা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথা ঘোরানোর চেষ্টা করতে টনটন করে উঠল ঘাড়। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। জানালাশূন্য একটা ছোট ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে ওকে। অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে।

পেছন থেকে বলে উঠল খসখসে মহিলা কণ্ঠ, 'হুঁশ তাহলে ফিরল। আগেই সাবধান করেছি আমাদের ব্যাপারে নাক না গলাতে। কথা কানে যায়নি। এখন বুঝবে ঠেলা।'

কথা বলতে বলতে ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল মিসেস ইসলাম। খিকখিক করে বিকৃত হাসি হাসল।

ঘরে একটামাত্র দরজা। সেটা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। পেছনে ভেজিয়ে দিয়ে গেল পাল্লা। পুরোপুরি লাগল না। ফাঁক হয়ে রইল। বাইরে থেকে তালা কিংবা ছিটকানি লাগানোরও প্রয়োজন বোধ করল না মহিলা। বেঁধে রেখেই নিরাপদ মনে করেছে।

টেনেটুনে দেখল কিশোর। নিরাপদ মনে না করার কোন কারণ নেই। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধেছে। সামান্যতম ঢিল করতে পারল না সে।

দরজার ওপাশে একটা পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল, টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, 'হালো? আমি জলিল। হাসপাতালের ওই ভলান্টিয়ার ছেলেটা বড্ড জ্বালাতন করছে। চুরি করে ঘরে ঢুকেছিল। ধরে বেঁধে রেখেছি। কি করব?' কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থাকার পর আবার বলল লোকটা, 'না না, ওসব খুনোখুনির মধ্যে

আমি নেই। আমি পারব না। পারলে আপনি অন্য কাউকে দিয়ে করানগে। রাখি।'

ফোন রেখে দিল লোকটা।

মিসেস ইসলামের গলা কানে এল, 'কাকে খুন করতে বলছে?'

'ছেলেটাকেও। ওর খালাকেও। বলছে, ওরা দুজন বেঁচে থাকলে ভীষণ বিপদে পড়ব আমরা। পুলিশকে গিয়ে বলে দেবে। ছেলেটা নাকি ওর খালাকে সব বলেছে।'

আঁতকে উঠল কিশোর। আয়না খালাকে খুন করার কথা বলছে। সর্বনাশ!

মরিয়া হয়ে আবার দড়ি টানাটানি শুরু করল সে। বেরোতে না পারলে দুজনেই মরবে। কোন লাভ হলো না। আরও কেটে বসল বাঁধন।

বিকট শব্দে বাজ পড়ল। থরথর করে কেঁপে উঠল বাড়িটা।

কি করা যায়? কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়? মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবার চেষ্টা করল সে। কোন উপায়ই বের করতে পারল না। বোকার মত এসে শত্রুর হাতে ধরা দিয়েছে। মিসেস ইসলামের সঙ্গে বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষ আছে, যার নাম জলিল। এই লোকটাই হয়তো সেদিন গাড়ি চালিয়ে দিপুকে নিয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় বিদ্যুতের আলোয় সাইকেল থেকে নামতে দেখেছে কিশোরকে। রান্নাঘরের দিকে ওকে এগোতে দেখে দরজার ছিটকানি খুলে রেখেছে। দেখতে চেয়েছে ও ঢোকে কিনা। নিজে লুকিয়ে থেকেছে অন্ধকারে।

ইস্, কি বোকামিই না করেছে। রাগে দুঃখে নিজের হাত

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

কামড়াতে ইচ্ছে করল। দরজাটা খোলা দেখে কেন কিছু সন্দেহ করল না? আজ বোধহয় ওর মরণই আছে কপালে, সেজন্যেই ওরকম বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিল।

আবার দড়ি খোলার প্রাণপণ চেষ্টা চালাল। বুঝল, কিছুতেই কিছু হবে না। অহেতুক শক্তিক্ষয়। অন্যের সাহায্য ছাড়া এই দড়ি সে কিছুতেই খুলতে পারবে না।

ভয়টা এখন বেশি আয়না খালার জন্যে। তাকে শেষ করতে নিশ্চয় লোক পাঠাবে জলিলের বস্—যে লোকটা খানিক আগে ফোন করেছিল। জলিল বলে দিয়েছে, সে খুন করতে পারবে না। অতএব আপাতত কিশোরের ভয়টা কম। খালাকে শেষ করার পর ওর ব্যবস্থা করতে আসবে খুনী।

খুন করার এটা উপযুক্ত সময়। ঝড়বৃষ্টি শুরু হতে দেরি নেই। হাসপাতাল থেকে খালা বেরোলে তার পিছু নেবে খুনী। নিশ্চয় রিকশা নেবে খালা। পথে তাকে খুন করার মত উপযুক্ত জায়গার অভাব হবে না। বাঁচাতে হলে এখন তার হাসপাতাল থেকে বেরোনো বন্ধ করতে হবে। আর করতে হবে তাকেই। অথচ সে হয়ে আছে বন্দি।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল।

জলিল এবং মিসেস ইসলামের আর কোন কথা শোনা গেল না। টেলিভিশনের আওয়াজ আসছে। চড়া ভলিউমে চালিয়ে দিয়ে নিশ্চয় এখন বসে টিভি দেখছে ওরা দুজন। হয়তো ওদের বসের আসার অপেক্ষায় আছে। কিংবা খুনীর। যে আয়না খালাকে খুন করে আসবে।

এত অসহায় আর জীবনে বোধ করেনি কিশোর। মুসা কিছু করবে না। ওর শরীর অতিরিক্ত দুর্বল। ও বেরোতেই পারবে না এই ঝড়বৃষ্টির রাতে। তাছাড়া বেরোবেই বা কেন? কোন ইঙ্গিত তো তাকে দিয়ে আসেনি সে। ইস্, আরেকটা বোকামি হয়ে গেছে। ওকে বলে আসা উচিত ছিল যে সে ভূতের গলিতে যাচ্ছে। সাইকেলটা নেয়ার সময় মোবারক আলিকে বললেও হত। দিপুকে চড় মারায় এভাবে মাথা গরম করে বেরোনো একেবারেই উচিত হয়নি ওর। সতর্ক না থাকার খেসারত এখন দিতে হবে ভালমত।

হাল ছেড়ে দিয়ে বসে বসে ভাবছে কিশোর। রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। ঠিক এই সময় খুট করে একটা শব্দ হলো।

মুখ তুলে তাকাল সে।

ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দরজার পাল্লা।

উঁকি দিল একটা ছোট্ট মুখ।

দিপু!

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

সতেরো

দিপুর গায়ে গেঞ্জি। পরনে হাফপ্যান্ট। পায়ে স্যাণ্ডেল বা জুতো কিছু নেই। নিশ্চয় বিছানা থেকে নেমে এসেছে। একহাতে পেঁচিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রেখেছে ভালুকটা। ভীত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ওকে দেখে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল কিশোরের মনে।

'তোমাকে বেঁধে রেখেছে কেন?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল সে।

'আস্তে কথা বলো!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'এদিকে এসো!'

পেছন ফিরে তাকাল দিপু। ঢোকার সাহস করতে পারছে না। জানে মিসেস ইসলাম দেখে ফেললে শক্ত চড় খাবে।

'জলদি করো দিপু! তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি আমি। যাবে আমার সঙ্গে?'

আবার পেছন দিকে তাকাল দিপু। ঢুকবে কি ঢুকবে না দ্বিধা করল আরও পাঁচ সেকেণ্ড। তারপর ঢুকে পড়ল।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

'লক্ষ্মী ছেলে! দরজাটা ঠেলে দাও। দিয়ে এসো এখানে। আমার কাছে।'

ঘরে ঢোকার পর যেন সাহস বেড়ে গেল দিপুর। কিশোরের কথামত পাল্লাটা ঠেলে দিল। এসে দাঁড়াল ওর চেয়ারের কাছে।

'শোনো, দিপু, আমি বিপদে পড়েছি। তুমিও বিপদে পড়েছ, আমি জানি। বাঁচতে হলে আমাকে এখন সাহায্য করতে হবে তোমার। এই যে, আমার এই পকেটে একটা ছুরি আছে। হাত ঢুকিয়ে সেটা বের করো।'

দ্বিধা করতে লাগল দিপু।

'জলদি করো!' তাড়া দিল কিশোর। 'দেরি করলে মিসেস ইসলাম চলে আসবে। তাহলে আর বেরোতে পারবে না।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল দিপু। বের করে আনল একটা ছোট ছুরি। বাইরে বেরোলে সব সময় পকেটে দু'চারটা ছোটখাট অতি প্রয়োজনীয় জিনিস রাখে কিশোর। গোয়েন্দাগিরি করতে করতে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

'এই তো, গুডবয়! এবার খোলো তো ছুরিটা। পারবে?'

'পারব। ছুরি দিয়ে কাঁচা আম কেটে খেতে আমার ভাল লাগে। আমারও একটা ছুরি ছিল। হারিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, এই ছুরিটা তোমাকে দিয়ে দেব। দড়ি কাটো। ভালুকটা নামিয়ে রাখো। তাহলে সহজ হবে। আগে এই হাতের দড়িটা কাটো,' ডান হাত দেখিয়ে দিল কিশোর।

ছেলেটা বুদ্ধিমান। যা যা করতে বলা হলো, ঠিক ঠিকমত করল। ছোট হলেও ছুরিটা অসম্ভব ধার। পোঁচ দিতেই দড়ি কেটে

গেল। আন্দাজ ঠিক রাখতে পারেনি দিপু। চামড়ায়ও লাগল পোঁচ। রক্ত বেরোতে লাগল। কেয়ারই করল না কিশোর। একটা হাত মুক্ত হতেই দিপুর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে কয়েক পোঁচে অন্য হাত আর পায়ের বাঁধন কেটে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভালুকটা আবার তুলে নিয়েছে দিপু।

ওকে কোলে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাধা দিল না দিপু। টেলিভিশনের জোরাল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বাঁ দিকে। ডান দিকে আরেকটা দরজা দেখা গেল। সেদিকে ছুটল সে।

ছিটকানি খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। দৌড় দিল গেটের দিকে। একছুটে গেট পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়। পেছন ফিরে তাকাল না আর।

টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঝোপের আড়াল থেকে সাইকেলটা বের করে ভালুকটাকে আটকাল পেছনের ক্যারিয়ারে। সামনের ডাণ্ডায় দিপুকে বসিয়ে দিয়ে শক্ত করে হ্যাণ্ডেল ধরে রাখতে বলল।

শাঁই শাঁই করে প্যাডেল ঘুরিয়ে চলল কিশোর। পেছন থেকে ঠেলে ওর গতি আরও বাড়িয়ে দিল ঝোড়ো বাতাস।

'কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো তোমার?' জিজ্ঞেস করল দিপুকে।

'না। আমি এভাবে সাইকেলে বসতে পারি। আসগর চাচা আমাকে এভাবে সাইকেলে বসিয়ে স্কুলে নিয়ে যেত।'

'আসগর চাচা কে?'

'আমাদের বাড়ির কাজের লোক।'

'কাল তোমাকে গাড়িতে করে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ওরা?'

'আমাকে কোথাও নেয়নি।'

'আমি নিজের চোখে দেখলাম গাড়িতে করে তোমাকে নিয়ে গেল। তুমি যেতে চাইছিলে না। জোর করে নিল। এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ?'

'আমাকে নেয়নি।'

'তবে কাকে নিল? আমি কি ভুল দেখলাম?'

'অপুকে নিয়েছে।'

অবাক হলো কিশোর। 'অপু কে?'

'আমার ভাই। আমার একটা যমজ ভাই আছে। দেখতে আমার মত।'

তক্ষণে ভেদ হলো ঘন ঘন দিপুর চেহারা পরিবর্তনের রহস্য। আসলে একেকবার একেকজনকে দেখেছে কিশোর। যমজ ভাই বলে চেহারায় খুব মিল দুজনের। বেমিলও আছে। টিকিট বিক্রি করতে গিয়ে যে ছেলেটাকে দেখেছিল কিশোর, সে অপু। সেজন্যেই ওকে চিনতে পারেনি। রান্নাঘরে যে ছেলেটাকে বসে থাকতে দেখেছিল ও, সেও দিপু নয়। অপু। গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যাকে। বাড়ির ভেতরে চিৎকার শুনেছে দিপুর। মোটেলের সামনে যাকে দেখেছে, সেও দিপু। তারমানে সে যে ভেবেছিল দিপুকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে আবার ফেরত আনা হয়েছে, সেটা ভুল। সে আগাগোড়া ওই বাড়িতেই ছিল।

'কোথায় নিয়ে গেছে তোমার ভাইকে, জানো?'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

'না জানি না!' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল দিপু, 'আমি অপুকে দেখতে চাই। ও কোথায় আছে?'

'তা তো আমিও জানি না!'

বৃষ্টি বাড়ছে ধীরে ধীরে। ঝাপটা মারছে দমকা বাতাস। সেই সঙ্গে বজ্রপাত। নিউমোনিয়া থেকে সবেমাত্র সেরে উঠেছে দিপু, এখন বৃষ্টিতে ভিজলে তার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। কথা বলার উপায় নেই। আরও দ্রুত প্যাডাল ঘোরাতে লাগল কিশোর।

কিন্তু যত তাড়াতাড়িই করুক, সাইকেলে গেলে না ভিজে যেতে পারবে না। কিছুদূর গিয়ে একটা রিকশা দেখে ডাক দিল। সাইকেলটা তালা দিয়ে রাস্তার ধারে কাত করে ফেলে রেখে রিকশায় উঠে পড়ল। যে ভাবে ফেলে যাচ্ছে চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। গেলে যাক। একটা সাইকেলের জন্যে দিপুকে ভেজানো ঠিক হবে না। আবার যদি অসুখটা বাড়ে, বাঁচানোই দায় হয়ে পড়বে।

রিকশায় উঠে নিজের শার্ট খুলে ওর চুল মাথা মুছিয়ে দিল সে। তারপর চিপে শার্টটা থেকে পানি বের করে আবার গায়ে দিল।

রিকশাওয়ালাকে বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি চালাও, ভাই। ক্যান্সার হাসপাতালে যাও।'

ভেবেচিন্তেই আগে হাসপাতালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। বাড়ি গেলে সময় নষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই যদি খালা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আর কিছু করার নেই। যদি না বেরোয়, তাহলে তাকে সাবধান করে দেয়া যাবে। হাসপাতালে

বসেই পুলিশকে ফোন করা যাবে।

কোনখান থেকে বাড়িতে আর হাসপাতালে ফোন করতে পারলেও হত। কিন্তু কোথায় পাবে ফোন? আমেরিকার মত তো আর রাস্তার ধারে ফোন বুদ নেই।

মোটর সাইকেলের শব্দ কানে এল। পেছন থেকে রিকশার পাশ কেটে বেরিয়ে গেল একটা লাল হোণ্ডা, হান্ড্রেড সিসি সিডিআই। হেলমেটের জন্যে আরোহীর মুখ দেখা গেল না। অরুণেরটাও লাল হোণ্ডা। এসেছেও ভূতের গলির দিক থেকে। সে-ই নয়তো?

আশ্চর্য! কালও গিয়েছিল। আজও? একই সময়ে? কাকতালীয় হতে পারে না ব্যাপারটা। নিশ্চয় ওর পিছু নিয়েছিল।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

আঠারো

হাসপাতালে যখন পৌঁছল কিশোর, অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাগ্যিস রিকশাটা নিয়েছিল। সাইকেলে করে আসতে গেলে মারাই পড়ত দিপু।

কিশোরের সঙ্গে রাতের বেলা এই বৃষ্টির মধ্যে রিকশায় করে আসতে খুব ভাল লাগছে ওর। এ রকম করে আর কোনদিন বেরোয়নি। এটা তার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। অ্যাডভেঞ্চার।

রিকশাওয়ালাকে ভেতরে ঢুকতে বলল কিশোর। একেবারে গাড়িবারান্দার ছাতের নিচে নিয়ে যেতে বলল।

নিয়ে গেল রিকশাওয়ালা।

নেমে পার্কিং লটের দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল কিশোরের দৃষ্টি। গোটা তিনেক মোটর সাইকেল আছে। তার মধ্যে একটা পরিচিত। লাল হোণ্ডা। হান্ড্রেড সিসি সিডিআই। চিন্তিত হলো সে। অরুণ এ সময় হাসপাতালে কেন?

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দিপুকে কোলে করে নিয়ে হাসপাতালের বারান্দায় উঠল কিশোর। ভালুকটাকে ছাড়েনি দিপু। জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

নিচতলায় রিসিপশন ডেস্কে একটা মেয়েকে বসে থাকতে দেখে খালার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। চিনতে পারল না মেয়েটা। কিশোর জানতে চাইল, হাসপাতালের বোর্ড অভ ট্রাস্টিদের মীটিং হচ্ছে কোনখানে। তাও বলতে পারল না মেয়েটা। 'বসে আছেন কি জন্যে এখানে?' জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল কিশোরের। কিন্তু করল না। অনুমান করল, মীটিং হাসপাতালের বড় কোন কর্মকর্তার অফিসে হওয়াটা স্বাভাবিক। ডিরেকটরের অফিস কয় তলায়, জানতে চাইল।

এর জবাব দিতে পারল মেয়েটা। দোতলায়।

দিপুকে ওখানে রেখে আসবে কিনা ভাবল কিশোর। নাহ্, নির্ভর করা যায় না এই মেয়ের ওপর। ওর দায়িত্বে রেখে যাওয়া যায় না। মিসেস ইসলাম আর জলিল নিশ্চয় এতক্ষণে জেনে গেছে দিপুকে নিয়ে পালিয়েছে কিশোর। আয়না খালার খোঁজে ও এখানে এসেছে যদি আন্দাজ করতে পারে, তাহলে এসে ঢুকেই দেখে ফেলবে ছেলেটাকে। আবার ধরে নিয়ে যাবে। রিসিপশনিস্ট আটকাতে পারবে না। দিপুকে কাছছাড়া করা তাই নিরাপদ ভাবল না।

দোতলায় উঠে এল সে। একজন ওয়ার্ডবয়কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল পরিচালকের অফিসটা কোনদিকে।

সিঁড়ির দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল। একটা ছায়া হারিয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। অরুণের মত লাগল।

দিপুকে কোলে নিয়ে দৌড় দিল কিশোর। অরুণ হলে ওকে জিজ্ঞেস করবে, ভূতের গলিতে গিয়েছিল কেন।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

কিন্তু ও চার তলায় উঠতে উঠতে হারিয়ে গেল অরুণ। কোথায় যে ঢুকে পড়ল, বোঝা গেল না।

এখানে উঠে এসে অবশ্য একটা সুবিধে পেল। দিপুকে বসিয়ে রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। দেখল ডিউটিতে আছে নার্স বিশাখা। এতরাতে দিপুকে সহ কিশোরকে দেখে চোখ কপালে উঠল ওর। জিজ্ঞেস করল, 'একে নিয়ে এলে কোত্থেকে?'

'সে অনেক কথা। আপনার কাছে বসিয়ে যাচ্ছি, দেখে রাখুন। ও হারালে কিন্তু পুলিশের ঝামেলায় পড়বেন, বলে দিলাম।' একটা চেয়ারে দিপুকে বসিয়ে দিল কিশোর। আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দিল না মহিলাকে। করিডরের দিকে ছুটল।

পেছনে তাকালে দেখতে পেত হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে নার্স।

আবার দোতলায় নেমে এল কিশোর। একজন পিয়নকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, ডিরেক্টরের অফিসেই মীটিং হয়েছে। শেষ হয়েছে আধঘণ্টা আগে। সদস্যরা প্রায় সবাই চলে গেছে। বেগম মেহেরুন্নিসাকে চেনে পিয়ন। মিনিট পনেরো আগেও তাঁকে হাসপাতালে দেখেছে।

'একা গেছেন, না কারও সঙ্গে?' জানতে চাইল কিশোর।

'শিকদার সাহেবের সঙ্গে দেখলাম ওপরতলায় যেতে। তারপর কোনখানে গেছেন জানি না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। পনেরো মিনিট আগে দেখেছে পিয়ন, তারমানে এখনও ওপরেই কোথাও আছে খালা। আর ডাক্তার শিকদার যতক্ষণ সঙ্গে আছেন, ততক্ষণ খালা নিরাপদ।

একা এখন বাসায় যাওয়ার চেষ্টা না করলেই হয়।

খালাকে খুঁজে বের করতে ছুটল সে। চার তলায় উঠে নার্স স্টেশনে ঢুকল। বিশাখার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'বেগম মেহেরুন্নিসাকে দেখেছেন?'

মাথা নাড়ল মহিলা, 'না তো। তিনিও এসেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণ ডিরেক্টরের অফিসে ছিলেন। মীটিঙে। ডিরেক্টরের পিয়ন বলল ডাক্তার শিকদারের সঙ্গে ওপরে উঠেছে। কোন তলায় গেল বুঝলাম না।'

শিফট-ইন-চার্জের নাম শুনে সতর্ক হয়ে গেল বিশাখা। ঢিলেঢালা ভাবটা দূর হয়ে গেল চোখের পলকে। সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। মাথা নেড়ে বলল, 'না, দেখিনি।'

ভালুকটাকে জড়িয়ে ধরে দিপু বসে আছে চুপ করে। ওকে বলল কিশোর, 'আরেকটু বসো, হ্যাঁ? আমি আসছি। তারপর তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

করিডরে বেরিয়ে খুঁজতে শুরু করল কিশোর। যে কটা দরজা বন্ধ দেখল, সবগুলো ঠেলে খুলে উঁকি দিতে লাগল ভেতরে। এ ভাবে উঁকি দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না জেনেও।

খুঁজতে খুঁজতে নিষিদ্ধ দরজাটার সামনে চলে এল সে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। ফাঁক হয়ে আছে। বিকেলে শ্রমিকরা বেরিয়ে যাওয়ার পর বোধহয় আর ঠিকমত লাগায়নি।

এই তলায় খোঁজা শেষ হয়েছে। দশ তলায় যাওয়ার জন্যে ঘুরল সে। কানে এল একটা শব্দ। মনে হলো দরজাটার ওপাশ থেকেই এসেছে। কান পাতল। শোনা গেল না আর। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

খালাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা দরকার। একা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেলে ওর এত কষ্ট সব বিফলে যাবে। পা বাড়াল সে। ঠিক এই সময় আবার শোনা গেল দরজার ওপাশে শব্দ। আশ্চর্য! এতরাতে ওই অন্ধকার অসমাপ্ত ফ্লোরে কে করে শব্দ? নার্স সাফিয়ার লাশের কথা মনে পড়ল। আবার কাউকে নিয়ে গিয়ে ওখানে খুন করা হচ্ছে না তো?

খুন!

আয়না খালা!

হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চাইল কিশোরের। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হলো। একটা মুহূর্তও দ্বিধা না করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

উনিশ

অন্ধকার ঘরটাকে সেদিনের চেয়েও ভয়ঙ্কর মনে হলো কিশোরের। বিপজ্জনক। এখানে একটা খুন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, আরেকটা হতে বাধা নেই। কালো কালো ভূতুড়ে ছায়াগুলো তেমনি অনড়। বিদ্যুৎ চমকানো কমে গেছে। ভালই হয়েছে। চমকানোর সময় তীব্র আলো, নিভে গেলে অন্ধকার অনেক বেশি।

পকেট থেকে ছোট একটা টর্চ বের করল সে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় এটাও নিয়েছিল সঙ্গে।

পেন্সিল টর্চের সামান্য আলোয় এতবড় ঘরের অন্ধকার তো কাটলই না, বরং কালো ছায়াগুলো আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। তবে দেখে এগোনো যায়, এটুকুই যা স্বস্তি। হঠাৎ করে কোন গর্তে পড়ে যাওয়ার কিংবা কোন জিনিসে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কিসের শব্দ শুনেছে, খুঁজতে শুরু করল সে। একই সঙ্গে মাথায় চলেছে ভাবনা। সেদিন দুটো মানুষ গায়েব হয়েছিল এখান থেকে—একজন জীবন্ত, আরেকজন মৃত। অরুণ এবং নার্স সাফিয়া। দুজনকেই দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেছে সে, কিন্তু বেরোতে দেখেনি। তারমানে দরজা ছাড়াও এখান থেকে বেরোনোর আরও

কোন পথ নিশ্চয় আছে।

খানিক আগে শব্দ করেছে যে, সে-ও বেরিয়ে যেতে পারে ওই পথ দিয়ে।

পথটা পেয়ে যেতে সময় লাগল না ওর। সেদিন অন্ধকারে হাতড়ে মরেছে। পরে লোকজন নিয়ে এসে যাও বা ঢুকেছিল, ওদের সঙ্গে থাকায় খুঁজতে পারেনি। পথটাও চোখে পড়েনি। আজ নিজের হাতে টর্চ থাকায় সহজেই বের করে ফেলল ওটা।

মেঝেতে একটা গোল ফোকর। তাতে দড়ি আর বাঁশ দিয়ে তৈরি সিঁড়ি ঝোলানো। শ্রমিকেরা বানিয়েছে। কাজ করার সময় তিন তলার ফ্লোরে যাতায়াতের জন্যে।

অরুণ কোন্ পথে পালিয়েছিল সেদিন বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। ওদের সাড়া পেয়ে ওই সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় নেমে লুকিয়ে পড়েছিল। ওরা চলে যাওয়ার পর উঠে এসে দরজা দিয়েই বেরিয়েছে। কিন্তু লাশটাকে গায়েব করল কিভাবে?

খুট করে শব্দ হলো পেছনে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। থাবা দিয়ে তার হাত থেকে ফেলে দেয়া হলো টর্চ। মেঝেতে পড়ে নিভে গেল ওটা। লম্বা একটা ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সামনে। ডান হাত তুলে রাখার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, পিস্তল উদ্যত করে রেখেছে।

প্রাণ বাঁচানোর প্রচণ্ড তাগিদে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন কিশোরের শরীরে। ঝট করে বসে পড়ল সে। পরক্ষণে ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে সরে গেল একটা ভারি মেশিনের অন্য পাশে। হামাগুড়ি দিয়ে সরে

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

যেতে লাগল আরেক দিকে।

এত তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারবে ও, ভাবেনি বোধহয় লোকটা। তাই সতর্ক ছিল না। ভেবেছিল টর্চটা ফেলে দিলেই ভয়ে কুঁকড়ে যাবে কিশোর। তখন যা ইচ্ছে করবে ওকে নিয়ে।

'ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো!' হুমকি দিল লোকটা। বিকৃত শোনাল কথা। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললে যেমন হয় অনেকটা তেমনি। চেনা চেনা লাগল কণ্ঠটা। অরুণ নয়।

চুপ করে রইল কিশোর।

'আমি জানি তুমি কোথায় আছ। বেরিয়ে এসো জলদি!' আবার বলল লোকটা।

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে কিশোর। গুলি করছে না কেন? শব্দ হয়ে যাওয়ার ভয়ে?

বেরোল না সে। নড়লও না। উঁচু করে সাজিয়ে রাখা কিছু বস্তার সঙ্গে গা মিশিয়ে বসে রইল।

এক পা ডানে সরল লোকটা। এগিয়ে আসতে শুরু করল। একেবারে ওর তিন হাতের মধ্যে চলে এল। শাসাল, 'তুমি ভেবেছ লুকিয়ে থেকে পার পাবে? মোটেও না। বেঁচে ফিরে যেতে পারবে না এখান থেকে।'

কিশোর বুঝে গেল, ওকে দেখতে পাচ্ছে না লোকটা। সঙ্গে টর্চ নেই, তাহলে জ্বালত। আন্দাজে কথা বলত না। সে এখন নড়লেই দেখে ফেলবে। গুলি করবে। দম বন্ধ করে বসে রইল।

দরজায় শব্দ হলো। ফিরে তাকাল কিশোর। আবার খুলে যাচ্ছে পাল্লাটা। করিডরের আলোয় দেখা গেল আরেকজন লম্বা লোক

ঢুকছে। পলকের জন্যে দেখা গেল ওকে। আবার ভেজিয়ে দিল দরজা।

ভেতরে ঢুকেছে লোকটা।

কে ও? পিস্তলধারীর সঙ্গী? তাহলে আর বাঁচতে হবে না। মৃত্যু অবধারিত। আয়না খালার ভাগ্যে কি ঘটেছে, খোদাই জানে!

পরের কয়েক সেকেণ্ডে ঘটে গেল অনেক ঘটনা। বড় একটা টর্চ জ্বলে উঠল দ্বিতীয় লোকটার হাতে। এগিয়ে আসতে শুরু করল। আলো পড়ল পিস্তলধারীর ওপর। দুপ করে গুলির শব্দ হলো। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। তাই বিকট শব্দ হয়নি। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। নিভে গেল টর্চ।

বোঝা গেল দ্বিতীয় লোকটা প্রথমজনের বন্ধু নয়। সন্দেহ হওয়ায় সে-ও নিশ্চয় দেখতে এসেছে এই অসমাপ্ত ফ্লোরে। গুলি কি শুধু টর্চেই লাগল? না গায়েও লেগেছে?

লাগেনি বোধহয়। তাহলে শব্দ করত।

টর্চের আলোয় পিস্তলধারীকে কিশোরও দেখতে পেয়েছে। চিনতে পারেনি। মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক পরা। কথাগুলো কেন বিকৃত হয়ে বেরোচ্ছিল, বুঝতে পারছে এখন। পিস্তলধরা হাতটা সামনে বাড়ানো। দুজন শত্রু এখন তার। যাকে দেখবে তাকেই গুলি করবে।

মরিয়া হয়ে উঠল হঠাৎ কিশোর। একলাফে উঠে দাঁড়াল। থাবা মারল লোকটার পিস্তল ধরা হাতে। খটাস করে মেঝেতে পড়ল ওটা। অস্ফুট শব্দ করে উঠল লোকটা। উবু হয়ে বসে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল। পিস্তল খুঁজছে।

এ রকম কোন সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল বোধহয় দ্বিতীয় লোকটা। ছায়ার মধ্যে থেকে আচমকা এসে মাস্ক পরা লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি।

কিশোরও বসে রইল না। পিস্তলটা খুঁজতে লাগল। পেয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। চিৎকার করে উঠল, 'যেই হোন আপনারা, উঠে দাঁড়ান! পিস্তল এখন আমার হাতে!'

থেমে গেল ধস্তাধস্তি।

দুটো ছায়ামূর্তিকে উঠে দাঁড়াতে দেখল কিশোর।

'ওটা আমাকে দিয়ে জলদি একটা টর্চ নিয়ে এসো, কিশোর!'

কণ্ঠ চিনতে কোন অসুবিধে হলো না কিশোরের। অরুণ। পরে যে ঢুকেছে।

পিস্তল দিতে দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। অরুণকে কি বিশ্বাস করা যায়? মনে হলো, যায়। সার্জিক্যাল মাস্ক পরা লোকটা যেহেতু তারও শত্রু। সে কে, এখন জানা হয়ে গেছে ওর। মাস্কের জন্যে কথা বিকৃত শোনাচ্ছিল বলে প্রথমে চিনতে পারেনি। এখন পেরেছে। অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে লোকটাকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে।

'বেরোচ্ছ না কেন? একটা টর্চ দরকার,' অরুণ বলল। 'আমার বিশ্বাস, তোমার খালাকেও এখানেই কোথাও ফেলে রেখেছে। জলদি যাও!'

আর দ্বিধা করল না কিশোর। পিস্তলটা অরুণের হাতে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'টর্চ পাব কোথায়?'

'দৌড়ে গিয়ে সিকিউরিটিকে খবর দাও। আমি একে আটকে রাখছি।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

বিশ

আয়না খালাকে পাওয়া গেল দেয়াল ঘেঁষে রাখা কতগুলো সিমেন্টের বস্তার আড়ালে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। মারা যাননি। মাথায় পিস্তলের বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছে।

তাড়াতাড়ি তাঁকে জরুরী বিভাগে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

মাস্ক পরা লোকটাকে নিয়ে আসা হলো হলঘরে। নার্স বিশাখা যেখানে ডিউটি দিচ্ছে।

পিস্তল তাক করে রাখার আর দরকার নেই। ওটা সিকিউরিটিদের হাতে দিয়ে দিয়েছে অরুণ। ওরাই এখন পিস্তল তাক করে পাহারা দিচ্ছে লোকটাকে।

একটানে ওর মুখোশ খুলে ফেলল অরুণ।

চমকে গেল সবাই। কিশোর বাদে। সে আগেই চিনে ফেলেছিল। শিফট-ইন-চার্জ! ডাক্তার শিকদার হেমায়েত হোসেন।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ডাক্তার। কারও দিকে তাকাচ্ছেন না। বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমরা সবাই ভুল করছ। আমি ক্রিমিন্যাল নই।'

'ক্রিমিন্যাল নন মানে?' ভুরু নাচাল অরুণ। 'আপনার চেয়ে বড়

পাষণ্ড আর কে আছে?' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'এই লোকই খুন করেছে নার্স সাফিয়াকে। তোমাকে আর তোমার খালাকেও খুন করতে যাচ্ছিল। আমার সন্দেহ হয়েছিল, আজ রাতে কিছু একটা ঘটাবে শিকদার। এবং সেটা মীটিঙের পরে। তাই অপেক্ষা করছিলাম। বাথরুমে গিয়েছিলাম, এই সুযোগে শিকদার তোমার খালাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। কোথাও খুঁজে না পেয়ে শেষে মনে হলো নিশ্চয় সেকেণ্ড উইঙে ঢুকেছে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দিল শরীরে। খুনটা করেই ফেলল নাকি ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম।'

'আমি সময়মত না ঢুকলে ঠিকই করে ফেলত। আর তুমি আসতে আরেকটু দেরি করলে আমি ধরা পড়ে যেতাম। তখন দুজনকেই করত। বেপরোয়া লোক। আমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি সবকিছু,' কিশোর বলল। 'নার্স সাফিয়া ডাক্তারের গোপন কথা জেনে ফেলে ব্ল্যাকমেল করছিল। প্রচুর টাকার দরকার ছিল ওর। কারণ মেয়েকে ছিনিয়ে নেয়ার ভয় দেখিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেল করছিল ওর স্বামী। খুন হতে হলো বেচারিকে। গোপন কথাটা কি, ডাক্তার সাহেব, বলবেন?'

আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন ডাক্তার। জবাব দিলেন না।

'গোপন কথাটা কি, আমি বলি,' অরুণ বলল। 'ছেলেধরা আর নারী পাচারকারী দলের সঙ্গে জড়িত শিকদার। জুয়া খেলার বদভ্যাস আছে। নিশ্চয় অনেক টাকা ধারদেনা করে বেকায়দা অবস্থায় পড়েছিল। ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আর

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

কোন উপায় না দেখে ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। দিপু আর ওর ভাইকে চিটাগাং কিংবা অন্য কোন শহর থেকে কিডন্যাপ করে এনে মিসেস ইসলামের বাসায় রাখা হয়েছিল। ওই মহিলাও ছেলেধরাদের দলের লোক। তার আরেক সহকারী জলিল। কপাল খারাপ এদের, দিপুর হলো নিউমোনিয়া। মারধর করে, অমানুষিক অত্যাচার করে আতঙ্কিত করে দিয়ে ছেলেদের মুখ বন্ধ রাখত ওরা। নিশ্চয় অযত্নে রেখে ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল, তাতে নিউমোনিয়ায় ধরেছিল ছেলেটাকে। আসলে শয়তানদের শায়েস্তা করার জন্যে ভগবান একটা না একটা পথ করেই দেন। দিপুকে হাসপাতালে আনার পর সেবা করতে গিয়ে সন্দেহ হয় নার্স সাফিয়ার। ডাক্তার শিকদারের রেফারেন্সে মিসেস ইসলামের ছেলে হিসেবে ভর্তি করা হয়েছিল ওকে হাসপাতালে। টাকা দিয়ে সাফিয়ার মুখ বন্ধ রাখতে চেয়েছিল শিকদার। কিন্তু স্বামীর চাপে পড়ে অনেক বেশি টাকা চেয়ে বসল মহিলা। ওকে খুন করে ঝামেলা চিরতরে সরিয়ে দিল শিকদার।'

অবাক হয়ে শুনছে দুজন সিকিউরিটি আর নার্স বিশাখা। দিপুর এ সবে আগ্রহ নেই। মিসেস ইসলামের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে সে এতেই খুশি। ভালুকটাকে জড়িয়ে ধরে আপনমনে কথা বলছে ওটার সঙ্গে।

'পাগলামি! সব মিথ্যে কথা!' বিড়বিড় করলেন ডাক্তার শিকদার।

'আর অস্বীকার করে লাভ নেই, ডাক্তার,' কঠোর হয়ে উঠল অরুণের দৃষ্টি। 'জয়াকে কি করেছেন, বলুন? কোথায় পাচার

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

করেছেন ওকে?'

'জয়া? কে জয়া? আমি ওকে চিনি না।'

প্রচণ্ড রাগে ঘুসি মারতে গেল অরুণ। ধরে ফেলল তাকে সিকিউরিটিরা।

'জয়া কে?' অরুণের দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার বোন?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'তোমার কথা থেকে আন্দাজ করলাম। তোমার বোনকেও কিডন্যাপ করেছে ওরা?'

মাথা ঝাঁকাল অরুণ। 'শিকদারকে সন্দেহ হয়েছিল আমার। ওর রেফারেন্সে ভর্তি করেছিলাম। সুস্থ হয়ে যেদিন রিলিজ পাওয়ার কথা, সেদিন এই হাসপাতাল থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছিল জয়া। পুলিশ কিছু করতে পারেনি। ওকে খুঁজে বের করার জন্যেই আমি এই হাসপাতালে ভলান্টিয়ারের কাজ নিয়েছি। নজর রেখেছি শিকদারের ওপর। লোকটার চালচলন আমার প্রথম থেকেই ভাল লাগছিল না।' আবার তাকাল ডাক্তারের দিকে, 'কি করেছেন আমার বোনকে?'

জবাব দিলেন না শিকদার।

'তোমার আর কষ্ট করার দরকার নেই,' অরুণকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর। 'পুলিশ ঠিকই কথা আদায় করে নেবে। একটা কথার জবাব দাও তো? নার্স সাফিয়ার পিছু পিছু তুমি কেন সেদিন সেকেণ্ড উইঙে ঢুকেছিলে?'

'আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম, শিকদার সাফিয়াকে ওখানে ছুটির পর দেখা করতে বলেছে। সন্দেহ হলো। তাই দেখতে

গিয়েছিলাম। আরেকটু আগে যেতে পারলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম মহিলাকে। মরণ আছে কপালে, কি আর করব। গিয়ে দেখি গলায় ছুরি মেরে খুন করে ফেলেছে ওকে শিকদার। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই সময় দরজা খুলে তুমি ঢুকলে। ওখানে দেখলে আমাকে সন্দেহ করবে সবাই। তাই পালালাম শ্রমিকদের দড়ি বেয়ে।'

'কিন্তু তোমাকে একবাক্স ছুরি চুরি করতে দেখেছি আমি সেদিন। ওই ছুরিরই একটা নার্সের গলায় গাঁথা ছিল।'

'ওই ছুরির একটা নয়, ওই ধরনের একটা ছুরি। এটা হাসপাতাল। সার্জিক্যাল নাইফের অভাব নেই। ডাক্তার শিকদারের পক্ষে ওরকম হাজারটা ছুরি যোগাড় করা সম্ভব।'

'কিন্তু তুমি চুরি করলে কেন?'

'আমি চুরি করিনি। ডাক্তার আকবর আমাকে বাক্সটা নিতে পাঠিয়েছিলেন। ওটা নিতে এসে দেখা হয়ে যায় মিসেস ইসলাম আর তোমার সঙ্গে। কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে যায়। তাই অমন তাড়াহুড়ো করে ছুরি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তোমার কাছে মনে হয়েছে চুরি।'

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর, 'আরেকটা রহস্যের জবাব পেলাম। সাফিয়ার লাশটা কি করে সরিয়েছেন ডাক্তার শিকদার, তাও বুঝতে পারছি। কি করে সরাবেন, সেটা আগেই ভেবে রেখেছিলেন। ওভাবেই করেছেন খুনটা। এমন জায়গায় ছুরি ঢুকিয়েছেন, যাতে রক্তপাত কম হয়। তিনি ডাক্তার, জানেন, কোথায় ছুরি ঢোকালে গলগল করে রক্ত বেরোবে না। মেঝেতে

রক্ত পড়ে থাকবে না। বেমালুম গায়েব করে দিতে পারবেন লাশটা। কেউ কোনদিন খোঁজই পাবে না নার্স সাফিয়ার। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, আমি দেখে ফেললাম লাশ।

'আমি যখন ঢুকেছি, তখনও তিনি সেকেণ্ড উইঙের চার নম্বর ফ্লোরে লুকিয়ে ছিলেন। আমি বেরিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একটা রোগীর বেড নিয়ে এলেন। তাতে লাশটা তুলে নিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। নিয়ে গিয়ে রেখে দিলেন লাশকাটা ঘরে। কেউ সন্দেহ করল না। হাসপাতালে সাদা অ্যাপ্রন আর সার্জিক্যাল মাস্ক পরা কোন লোক যদি রোগীর বিছানা ঠেলে নিয়ে যায় কে সন্দেহ করবে? চাদরের নিচে লাশ আছে, না রোগী, কেউ বুঝতে পারবে না। আমিও পারিনি। ডাক্তার হারুণকে সেকেণ্ড উইঙে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি একটা লোককে দেখেছি বেড ঠেলে নিয়ে যেতে। সে-ই যে ডাক্তার শিকদার ঘুণাক্ষরেও যদি বুঝতাম···লাশটা কি করেছেন, ডাক্তার? বলবেন?'

এ প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না ডাক্তার।

'ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা,' কিশোর বলল, 'রেকর্ড রুম থেকে দিপুর ফাইলটাও আমার ধারণা ডাক্তার শিকদারই সরিয়েছেন। এর কোন প্রয়োজন ছিল না অবশ্য। ক্রিমিন্যালদের মন দুর্বল থাকে তো, তাই এই অতিরিক্ত সতর্কতা।'

পুলিশকে ফোন করে দেয়া হয়েছে আগেই। চারজন কনস্টেবল নিয়ে হলে ঢুকলেন একজন দারোগা। শিকদারের হাতে হাতকড়া পরানোর নির্দেশ দিলেন একজন কনস্টেবলকে।

'আমি কি করেছি যে আমাকে অ্যারেস্ট করছেন?' প্রতিবাদ

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

জানালেন শিকদার।

'আপাতত একটা কারণই যথেষ্ট,' কঠোর স্বরে জবাব দিলেন দারোগা। 'ইমার্জেন্সিতে বেগম মেহেরুন্নিসার সঙ্গে কথা বলে এসেছি আমি। হুঁশ ফিরেছে তাঁর। তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, মীটিঙের পর আপনি নাকি তাঁকে বলেছেন, নার্স সাফিয়ার মৃত্যু রহস্য আপনি ভেদ করে ফেলেছেন। কিভাবে করেছেন, সেটা বুঝতে হলে সেকেণ্ড উইঙে যাওয়া দরকার বেগম মেহেরুন্নিসার। তিনি দুঃসাহসী মহিলা। তাছাড়া আপনার মতলব বুঝতে পারেননি। অনেক দিনের পরিচয়, তাই আপনাকে সন্দেহ করার কথাও মনে হয়নি তাঁর। নির্দ্বিধায় চলে গেছেন আপনার সঙ্গে। ভেতরে ঢুকেই তাঁকে খুন করার জন্যে ছুরি বের করেন আপনি। সেটা দেখে ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। এই সময় নাকি কে একজন ঢুকে পড়ে ফ্লোরে···'

'আমি,' কিশোর বলল। 'শব্দ শুনে আমি ঢুকে পড়ি।'

ভুরু কুঁচকে তাকালেন দারোগা। 'তুমি কে?'

'আমি মেহেরুন্নিসার বোনপো।'

'ও। তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব।' আবার শিকদারের দিকে তাকালেন দারোগা, 'তখন পিস্তল দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে বেগম মেহেরুন্নিসাকে আপনি বেহুঁশ করে ফেলেন। অতএব আপাতত খুনের চেষ্টার দায়ে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি, নাকি, কি বলেন? অ্যাটেম্পট টু মার্ডার।'

'আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলব।'

'সে সুযোগ আপনি থানায় গিয়েও পাবেন। চলুন এখন।'

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

একুশ

পরদিন।

সকালবেলা আয়না খালার বাসায় হাজির হলো অরুণ। দারোগা সাহেবও এসেছেন। সব কথা জানার জন্যে। এতক্ষণে তাঁর নাম জানা হয়ে গেছে কিশোরের। ইউসুফ আহমেদ।

বসার ঘরে বসেছে তিন গোয়েন্দা, অরুণ, আয়না খালা আর দারোগা। দিপুও আছে। ভালুকটাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। এ বাড়িতে এসে বেশ সুখি সে। মিসেস ইসলামের বাড়ির চেয়ে অনেক ভাল জায়গা। একেবারে তার নিজের বাড়ির মত।

ওদের বাড়ি চিটাগাঙে, জানিয়েছে সে। একদিন স্কুল ছুটি হলে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল দুই ভাই। আসগরচাচা এসে ওদের নিয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন এল অন্য এক লোক। নাম বলল জলিল। আসগরচাচা নাকি ওদের নিতে পাঠিয়েছে। কোন সন্দেহ করল না দুই ভাই। উঠে বসল জলিলের বেবিট্যাক্সিতে। কিছুক্ষণ পর দিপুর নাকের কাছে একটা রুমাল চেপে ধরল জলিল। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। পরে দেখল, একটা মাইক্রোবাসে করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের। অপরিচিত লোকজন দেখে

চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল সে। প্রচণ্ড মার মেরেছে ওকে তখন জলিল। ভয়ে আর টুঁ শব্দ করেনি দিপু।

নোটবুক আর বলপেন বের করে তৈরি হলেন দারোগা ইউসুফ।

বলতে আরম্ভ করল কিশোর।

একেবারে গোড়া থেকে সবিস্তারে সব জানাল। একটা কথাও বাদ দিল না।

নীরবে লিখে নিলেন দারোগা। মাঝেমধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করলেন।

আয়না খালার স্বীকারোক্তি অ্যাগেই নিয়েছেন। কিশোরের নিলেন। দিপুকে প্রশ্ন করলেন। তারপর ফিরলেন অরুণের দিকে।

কিভাবে ওর বোন জয়াকে খোঁজার জন্যে হাসপাতালে কাজ নিল অরুণ, জানাল পুলিশকে। মিসেস ইসলামকে সেও সন্দেহ করেছিল। রাতে লুকিয়ে তাই ওর বাড়িতে গিয়েছিল ওখানে কি ঘটছে জানার জন্যে। কাকতালীয় ভাবে দেখা হয়ে যায় কিশোরের সঙ্গে। ঠিক কাকতালীয়ও বলা যাবে না। দুজনে একই সময়ে হাসপাতালের ডিউটি শেষ করে গিয়েছে, মিলে গেছে তাই তদন্তের সময়টা। দ্বিতীয় দিন অরুণ যায়নি। সেদিন রাস্তায় মোটর সাইকেল যেটা দেখেছে কিশোর, সেটা অন্য কারও হবে। আরেকটা তথ্য জানা গেল অরুণের কাছে। দিপু হাসপাতালে কান্নাকাটি করত বলে ওকে ঘুমের হালকা ডোজের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখত সাফিয়া। যাতে ও কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারে। কেউ কিছু জেনে না ফেলে।

'কিন্তু বিধি বাম,' বলে উঠল রবিন। 'ঠিকই জেনে ফেলল কিশোর পাশা। ওকে ফাঁকি দিতে পারল না সাফিয়া।'

সবার কথা শোনার পর দারোগা বললেন, 'শিকদার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। জয়াকে কোথায় নিয়ে গেছে, বলেছে। ওকে আনার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনাদের কথার সঙ্গে শিকদারের কথা মিলে যাচ্ছে সব।'

হেসে বললেন আয়না খালা, 'সেজন্যেই আগে আমাদের কথা শুনে নিলেন, মিথ্যে বলছি কিনা।'

দারোগাও হেসে ফেললেন। 'কি আর বলব, আপা, চোর-ডাকাত নিয়ে কারবার করতে করতে আমাদের স্বভাবই হয়ে গেছে এ রকম। নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করি না এখন।'

'ওর দলের লোকদের ধরা হয়েছে?'

'কক্সবাজারে যাদের পেয়েছি, ধরেছি। অন্য জায়গায়ও ধরার চেষ্টা চলছে। বাচ্চা আর মহিলাদের লুকিয়ে রাখার কয়েকটা ঘাঁটি আছে ওদের এখানে। পাহাড়ের মধ্যে আস্তানা করার জায়গার অভাব নেই। পাচার করারও সুবিধে। টেকনাফ দিয়ে মিয়ানমারে নিয়ে যায়। কিংবা নাফ নদী পেরিয়ে ভারতে। সেখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান করে দেয়।'

'উফ্, শয়তানের দল!'

'তো, যাই, আপা আজ। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।'

'আরে যাচ্ছেন কোথায়, বসুন। চা আসছে।'

কিশোর বলল, 'দারোগা সাহেব, সাফিয়ার লাশটাকে কি

করেছে, বলেছে নাকি শিকদার?'

মুখ কালো হয়ে গেল দারোগার। 'লাশকাটা ঘরে নিয়ে নিজেই কাটাকুটি করে এমন করে রেখেছিল লাশটাকে, যাতে কেউ চিনতে না পারে।'

'খাইছে!' শিউরে উঠল মুসা, 'এ তো পিশাচ!' অসুখ অনেকটা কমেছে ওর। ঘন ঘন বাথরুমে যাওয়া বন্ধ হয়েছে।

আনমনে বিড়বিড় করলেন আয়না খালা, 'চেহারা দেখে মানুষ চেনা যায় না। এতদিন ধরে জানি ওকে। কত নিরীহ, ভালমানুষ ভেবেছি। ওর ভেতরে যে ইবলিস লুকিয়ে আছে, কে জানত!'

****

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

তিন গোয়েন্দার আগামী বই

মায়ানেকড়ে

রকিব হাসান

র‍্যাঞ্চহাউসে ঘটতে শুরু করল অদ্ভুত ঘটনা।
কিসে যেন মেরে রেখে যায় গবাদি পশুগুলোকে।
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শটগান হাতে পাহারায়
বসলেন র‍্যাঞ্চের মালিক ডেভিড হুইটম্যান।
প্রচণ্ড ঝড়ের রাত। বিদ্যুতের আলোয় যা দেখলেন,
গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল।
রূপকথার জানোয়ার জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছে।
মানুষের মত হাত-পা, চেহারাটা নেকড়ের।
বড় বড় নখ। রোমশ শরীর।
ভয়ঙ্কর, অবিশ্বাস্য দৃশ্য!
তবে কি ইনডিয়ানদের কথাই ঠিক?
সত্যি আছে মায়ানেকড়ে?

জড়িয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।
ভয়ঙ্কর পিশাচের তাড়া খেয়ে বুঝল,
প্রাণ বাঁচানো এবার সত্যি দায়।

মায়াজাল

অদ্ভুত চিঠি!
একসারি নাম লেখা তাতে।
প্রথম নামটা যার, তাকে বলা হয়েছে
এমন এক কাজ করতে যা
কেবল নরপিশাচের পক্ষেই সম্ভব।
তারপর নিজের নাম কেটে চিঠিটা পাঠিয়ে
দিতে হবে দ্বিতীয় নামটা যার, তার কাছে।
যদি না পাঠায়?
ভয়ঙ্কর পরিণতি; যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটবে তার।
মুসা আমানও বাদ পড়ল না নামের তালিকা থেকে।
মানুষ খুন করতে প্ররোচিত করা হলো ওকে।
অতএব, খুন করার জন্যে তৈরি হলো সে।

এবং আরও আসছে

প্রেতাত্মার প্রতিশোধ

কবর থেকে উঠে এসেছে এক ভয়ঙ্কর পিশাচ!
এবার কে ওর শিকার? মুসা, না রবিন?
হাজার বছর ধরে টিকে থাকা ওই
ভয়াল প্রেতকে মারতে হলে চেতনার গভীরে
ডুব দিতে হবে কিশোরকে;
জানতে হবে কি করলে
চিরতরে ধ্বংস হবে ওই বিভীষিকা,
আর কোনদিন জ্বালাতে আসবে না মানুষকে।
নিজের মন থেকে একটা জবাবই খুঁজে পেল সে—আত্মহত্যা!
নিজেকে ওর শেষ করে দেয়া ছাড়া
ওটাকে ধ্বংস করার আর কোনই উপায় নেই।